POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026--2028

আল্লাহ্‌র বাণী

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۚ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

নিশ্চয়ই যারা তোমার হাতে বায়'আত করে, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই হাতে বায়'আত করে। আল্লাহর হাতই তাদের হাতের ওপর রয়েছে। অতএব যে কেউ তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, সে তো নিজেরই ক্ষতির জন্য অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। আর যে ব্যক্তি সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করে, যা সে আল্লাহর সঙ্গে করেছে, তবে আল্লাহ অবশ্যই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। (আল মায়েদা: ৭৪)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 11

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 4

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 22 Jan 2026 3 শাবান 1447 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

বাহ্যিক কার্যকলাপের ভিত্তিতে বিচার এবং অন্তরের হিসাব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে কিছু লোকের সঙ্গে ওহীর ভিত্তিতে হিসাব নেওয়া হতো। কিন্তু এখন ওহী বন্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং আমরা তোমাদের কেবল সেই সব কাজের ভিত্তিতেই বিচার করব, যা আমাদের কাছে প্রকাশ পায়। অতএব, যে ব্যক্তি আমাদের কাছে ভালো কাজ প্রকাশ করবে, আমরা তার প্রতি সন্তুষ্ট হব, তাকে আমাদের নিকটবর্তী করব, আর তার অন্তরের বিষয়ে আমাদের কোনো সংশ্লিষ্টতা থাকবে না; তার অন্তরের হিসাব আল্লাহই গ্রহণ করবেন। আর যে ব্যক্তি আমাদের কাছে মন্দ কাজ প্রকাশ করবে, আমরা তার প্রতি সন্তুষ্ট হব না এবং তাকে সত্যবাদী বলেও গণ্য করব না, যদিও সে দাবি করে যে তার অন্তর ভালো।

যত বেশি ধনী মানুষ, ততই সে অধিক অভাবগ্রস্ত-তবে সে ব্যক্তি ব্যতিক্রম,যে তার সম্পদ যথাযথভাবে ব্যয় করে

(২৩৮৮) হযরত আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী (সা.)-এর সঙ্গে ছিলেন। তখন নবী (সা.) উহুদ পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বললেন:

"এই পাহাড়টি যদি আমার জন্য সোনায় পরিণত করে দেওয়া হয়, তবুও আমি পছন্দ করব না যে, এর একটি দিনারও তিন দিনের বেশি আমার কাছে থেকে যায়-ঋণ পরিশোধের জন্য যে দিনারটি রেখে দিই, তা ব্যতীত।"এরপর তিনি (সা.) বললেন: "যত বেশি ধনী মানুষ, ততই সে অধিক অভাবগ্রস্ত-তবে সে ব্যক্তি ব্যতিক্রম, যে তার সম্পদ এভাবে ব্যয় করে।"

(সহিহ বুখারি, খণ্ড ৪, কিতাবুল ইস্তিকরাজ, প্রকাশিত ২০০৮, কাদিয়ান)

নিশ্চয়ই স্মরণ রেখো-সব নবীকেই তাঁদের তাবলীগের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র বাণী

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাতু ওয়াস্‌সালাম) বলেন-

"এ কথা সত্য যে, যারা আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে আগমন করেন, শুরুতেই দুনিয়াদার লোকেরা তাদের শত্রু হয়ে যায় এবং নানাবিধ কষ্ট দেয়, তাদের পথে পথে বাধা সৃষ্টি করে। এমন কোনো নবী বা রাসূল আসেননি যিনি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেননি, যাঁকে ধূর্ত, প্রতারক কিংবা ধান্দাবাজ বলে অভিহিত করা হয়নি। কিন্তু এ সত্ত্বেও, যদিও কোটি কোটি মানুষ তাঁদের প্রতি সর্বপ্রকার তীর নিক্ষেপ করতে চেয়েছে, পাথর ছুড়েছে, গালিগালাজ করেছে-তবুও তাঁরা এসবের কোনো তোয়াক্কা করেননি। কোনো বিষয়ই তাঁদের পথ রুদ্ধ করতে পারেনি। তাঁরা দুনিয়াকে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী শোনাতে থেকেছেন এবং যে বার্তা নিয়ে তাঁরা আগমন করেছিলেন, তা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে কোনো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দিকও অবহেলা করেননি।

অজ্ঞ দুনিয়াদারদের পক্ষ থেকে যে কষ্ট ও নির্যাতন তাঁদের ওপর আপতিত হয়েছে, তা তাঁদেরকে শিথিল করেনি; বরং তাঁরা আরও দৃঢ় ও দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হতে থেকেছেন। অবশেষে সেই সময় এসে গেছে, যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের জন্য সেই সব কঠিনতা সহজ করে দিয়েছেন এবং বিরোধীদেরও উপলব্ধি হয়েছে। অতঃপর সেই একই বিরোধী দুনিয়া তাঁদের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়েছে এবং তাঁদের ন্যায়পরায়ণতা ও সত্যতার স্বীকৃতি দিতে শুরু করেছে। হৃদয়সমূহ আল্লাহ্ তা'আলার হাতেই রয়েছে; তিনি যখন চান, তখনই সেগুলো পরিবর্তন করে দেন।

নিশ্চয়ই স্মরণ রেখো-সব নবীকেই তাঁদের তাবলীগের ক্ষেত্রে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), যিনি সকল নবী (আলাইহিমুস সালাম)-এর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম, এমনকি যাঁর ওপর আল্লাহ্ তা'আলা নবুয়তের ধারাবাহিকতা সমাপ্ত করেছেন-অর্থাৎ নবুয়তের সকল পূর্ণতা স্বভাবগতভাবে তাঁর মধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে-এমন মহান নবী হওয়া সত্ত্বেও কে না জানে যে, রিসালাতের তাবলীগে তাঁকে কত বিপদ ও কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং কাফিররা কত চরম পর্যায়ে তাঁকে নির্যাতন ও দুঃখ দিয়েছে।"

(মালফূযাত, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৫২, সংস্করণ ১৯৮৮)

খোদার প্রতি ভক্তিজনিত ভীতি

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

হযরত মুসলেহ-এ-মাও'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূরা আল-রাদ এর ১২৬ নম্বর আয়াত- এর ব্যাখ্যায় বলেন:

যেহেতু দ্বীনের প্রচার এখন ব্যাপক হওয়ার ছিল এবং যেসব ইহুদি ও খ্রিস্টানদের নিকট ঐশী গ্রন্থ ছিল, তাদের মধ্যেও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছানোর কথা ছিল-এ কারণে বলা হয়েছে যে, তাদের মোকাবিলায় অধিক দৃঢ়তার প্রয়োজন। মুশরিকদের ক্ষেত্রে বিষয়টি তুলনামূলকভাবে সহজ ছিল; কারণ শির্কের খণ্ডন করলেই সব বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে যেত। কিন্তু ইহুদি ও খ্রিস্টানদের মোকাবিলায় শরিয়তের বিস্তারিত আলোচনায় প্রবেশ করাও অপরিহার্য ছিল। এজন্য শুরু থেকেই এই বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছে যে, দাওয়াত দিতে হবে হিকমতের সঙ্গে (দাওয়াত বিল-হিকমাহ)।

হিকমতের বিভিন্ন অর্থের প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় যে, এই আয়াতে বহু ব্যাখ্যা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হিকমত বলতে বোঝায়-জ্ঞান, পরিপক্বতা, ন্যায়বিচার, নবুয়ত, সহনশীলতা ও ধৈর্য; এমন বিষয় যা অজ্ঞতা থেকে বিরত রাখে; এমন কথা যা সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এবং সময় ও পরিস্থিতির উপযোগী বক্তব্য। এই সব অর্থই এখানে প্রযোজ্য। সুতরাং বলা হয়েছে-"হিকমতের সঙ্গে আহ্বান করোচ; অর্থাৎ জ্ঞানভিত্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে কথা উপস্থাপন করো; পূর্ববতী নবীদের সহিফা ও গ্রন্থসমূহের ভিত্তিতে বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করো।

দুঃখের বিষয় হলো, মুসলিম মুফাসসিরগণ সাধারণত এই নির্দেশনার প্রতি যথাযথ মনোযোগ দেননি। বরং শোনা কথার ওপর নির্ভর করে তাঁরা বাইবেল সম্পর্কিত এমন সব উদ্‌ধৃতি তাঁদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা আজও ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণের সুযোগ করে দেয়। এর আরেকটি দিক হলো-দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত যুক্তি পেশ করা এবং কোনো কথাই যেন কাঁচা বা দুর্বল না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা। কখনো কখনো মানুষ সমর্থনমূলক যুক্তিকে স্বতন্ত্র প্রমাণের মতো করে উপস্থাপন করে ফেলে; যার ফল এই হয় যে, প্রতিপক্ষ সেগুলোকেই আঁকড়ে ধরে। তাই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে-প্রথমে প্রতিটি যুক্তি ভালোভাবে যাচাই করো; তারপর কেবল সেটিই পেশ করো যা পোক্ত ও শক্তিশালী।

(তাফসীরে কাবীর, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৯, সূরা আন-নাহল, আয়াত ১২৬-এর তাফসির)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

সীরাত খাতামুন নবীয়্যিন

–হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ (রা.)

জলবায়ু

ভূগোলবিদরা জানেন যে বাইরের দিক থেকে যে বায়ু আরব উপদ্বীপে প্রবেশ করতে পারে, তা কেবল দুই দিক থেকেই আসে–উত্তর ও পূর্ব দিক থেকে এবং দক্ষিণ–পশ্চিম দিক থেকে। কিন্তু আরবের এই দুই দিকেই প্রায় সর্বত্র স্থলভাগ অবস্থিত; ফলে এই বায়ুগুলো স্বভাবতই শুষ্ক। এ কারণেই এ দেশে সাধারণত বৃষ্টিপাত খুবই অল্প হয়। তবে পার্বত্য অঞ্চলে এই বায়ু থেকেই কিছুটা আর্দ্রতা আহরণ করা সম্ভব হয়, ফলে সেখানে কিছু পরিমাণ বৃষ্টি হয়। কর্কটক্রান্তি রেখা দেশের মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে–এ বিষয়টিও আরবের মরুভূমিময় অবস্থা ও বৃষ্টির স্বল্পতার ব্যাখ্যা দেয়; কারণ ভূগোলবিদদের নিকট সুপরিচিত যে এ ধরনের অঞ্চল স্থায়ী বায়ুর দিক থেকে একপ্রকার শান্ত অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত। অতএব সামগ্রিকভাবে বলা যায়, আরব একটি অত্যন্ত শুষ্ক দেশ; এবং ভৌগোলিক অবস্থান ও ভূপ্রকৃতির কারণে এটি সাধারণত খুবই উষ্ণ। সুতরাং এর জলবায়ুকে মোটের ওপর উষ্ণ ও শুষ্ক বলা যায়।

আরবে দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত বেশি। এর কারণ হলো বালুর প্রাচুর্য; বালু দিনে প্রচণ্ড উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং রাতে খুব দ্রুত তাপ বিকিরণ করে ঠান্ডা হয়ে যায়। শিশিরের প্রাচুর্যও এই কারণেই ঘটে। কখনো কখনো আরবে এক প্রকার উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়, যাকে 'সামূম' বলা হয়। এই বায়ু প্রবাহিত হলে চারদিক ঘোর অন্ধকারে ছেয়ে যায় এবং এত বেশি বালু উড়ে আসে যে অনেক সময় তা জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষতির কারণ হয়। শীতকালে দেশের কিছু অংশে প্রচণ্ড শীতও অনুভূত হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে পড়ব যে, যে সময়ে পবিত্র নবী (আল্লাহ তাঁর ওপর শান্তি ও বরকত বর্ষণ করুন) খন্দকের যুদ্ধের সম্মুখীন হন, সে সময়ে মদিনায় শীত এতটাই তীব্র ছিল যে মানুষ কাঁপতে থাকত এবং রাতে বিছানা ছেড়ে ওঠার জন্য অসাধারণ সাহসের প্রয়োজন হতো। অথচ একই অঞ্চল গ্রীষ্মকালে চুল্লির মতো জ্বলতে থাকে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

উদ্ভিদের দিক থেকে আরব একটি অত্যন্ত দরিদ্র দেশ। কোথাও কোথাও শত শত মাইল জুড়ে সবুজের কোনো চিহ্নই দেখা যায় না; অধিকাংশ ভূমিই শুষ্ক পর্বত ও অনুর্বর মরুভূমিতে পরিপূর্ণ। এখানকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎপাদন হলো খেজুর গাছ, যা দেশের প্রায় সব জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে জন্মায় এবং যার বহু জাত রয়েছে। এটি আরবদের প্রধান ও মৌলিক খাদ্য; এর ওপরেই তারা মূলত জীবিকা নির্বাহ করে এবং এর দ্বারা নানা ধরনের দ্রব্য প্রস্তুত করে। আরবের কিছু অঞ্চলে অন্যান্য ফলও পাওয়া যায়, এবং যেখানে পানির ব্যবস্থা আছে সেখানে মানুষ বাগান তৈরি করেছে। হিজাজ অঞ্চলে তাইফ বিশেষভাবে তার বাগানের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং আজও তা রয়েছে।

যেসব অঞ্চলে কৃষিকাজ সম্ভব–যেমন কিছু উপকূলীয় এলাকা এবং পাহাড়ি উপত্যকা–সেখানে কিছু গোত্র কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকে এবং নিজেদের প্রয়োজনের জন্য কিছু শস্য উৎপাদন করে। ফলে কোথাও কোথাও বাজরা ও জোয়ার চাষ করা হয় এবং কিছু পরিমাণ গমও উৎপন্ন হয়। অনেক এলাকায় শিম ও মসুর ডাল প্রচলিত। কিছু শাকসবজিও চাষ করা হয়; কফি ও ঝাল মসলাও পাওয়া যায়। বৃষ্টিনির্ভর অঞ্চলে ঘাস ভালো জন্মে; এসব এলাকা পশুদের চারণভূমি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। প্রতিটি গোত্রের নিজস্ব নির্ধারিত চারণভূমি থাকে। বিশেষত নজদ মালভূমি চারণভূমির একটি কেন্দ্র।

প্রাণিজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে তিনটি প্রাণী বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ–উট, ঘোড়া ও গাধা। উট যেন আরব জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এটি ছাড়া আরবের মতো দেশে ভ্রমণ প্রায় অসম্ভব। প্রয়োজন হলে এর মাংসও খাওয়া হয়। কিছু বিশেষ গুণের কারণে আরব ঘোড়া বিশ্বে একটি মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান লাভ করেছে। আরবরা একে অত্যন্ত স্নেহ করে এবং সাধারণত এর বংশ দেশের বাইরে যেতে দেয় না। নজদি ঘোড়াকে আরবে বিশেষ সম্মানের চোখে দেখা হয়। গাধাও প্রচুর পাওয়া যায় এবং আরোহনের কাজে ব্যবহৃত হয়; ইসলাম–পূর্ব যুগে আরবরা এর মাংসও খেত। ভেড়া ও ছাগলও প্রচুর রয়েছে এবং ধনীরা এদের বড় বড় পাল রাখে। গরু ও বলদও পাওয়া যায়, তবে সংখ্যায় কম। আরবে মহিষ পাওয়া যায় না।

বন্যপ্রাণীদের মধ্যে কিছু অঞ্চলে সিংহ ও চিতা পাওয়া যায়। নেকড়ে, হায়েনা, বানর ও শেয়াল বেশ সাধারণ। হরিণও পাওয়া যায় এবং পাহাড়ি অঞ্চলে বন্য ছাগল দেখা যায়। বন্য গাধা (গোর–খর)ও রয়েছে, এবং আরবরা এগুলো শিকার করতে পছন্দ করে।

পাখিদের মধ্যে সাধারণ পাখিদের কথা বাদ দিলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য কেবল উটপাখি। এটি দীর্ঘ পা–যুক্ত একটি অত্যন্ত বড় পাখি এবং এত দ্রুত দৌড়ায় যে ঘোড়াও এর কাছাকাছি যেতে পারে না।

সরীসৃপদের মধ্যে কেবল গিরগিটির মতো প্রাণীই প্রচুর পাওয়া যায়; অন্যান্য প্রজাতি কম, যদিও সর্প শ্রেণীর কয়েকটি প্রাণী বিদ্যমান।

পঙ্গপাল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়; এর মাংস খাওয়া হয় এবং এগুলো বাগান ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি করে। উপকূলীয় এলাকায় মাছও পাওয়া যায় এবং মানুষ সেগুলো ধরে।

আরবে খনিজ সম্পদ খুবই সীমিত। মূল্যবান ও উপযোগী ধাতু প্রায় নেই বললেই চলে। কিছু সীসা ও তামা পাওয়া যায়; পাশাপাশি অল্প পরিমাণ রূপা ও লোহাও রয়েছে। কয়লা, গন্ধক ও লবণও পাওয়া যায়। কোথাও কোথাও সোনা রয়েছে; একজন ইংরেজ, মি. বার্টন, মিদিয়ানে সোনা অনুসন্ধান করেছিলেন, কিন্তু সফল হননি। বাহরাইনের উপকূল থেকে মুক্তাও আহরণ করা হয় এবং এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য রয়েছে। আধুনিক যুগে আরবে বিপুল পরিমাণ পেট্রোলিয়ামের ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে।

(চলবে....)

(সীরাত খাতামুন নবিয়্যিন, পৃষ্ঠা ৪৪–৪৬, কাদিয়ান থেকে প্রকাশিত)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন:

আমার অভিমত হল, সুদের অর্থ নিজের জন্য ব্যয় করা সম্পূর্ণরূপে হারাম সেটি ব্যক্তিগত যে কোন প্রয়োজনেই হোক না কেন। নিজ সন্তানদেরকে তা প্রদান করা অথবা ফকির–মিসকিনকে প্রদান করাও হারাম।

(আল হাকাম, ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯০৫)

যুগ খলীফার বাণী

"সব সময় মনে রেখো– ধর্মীয় জ্ঞান অর্জনের মূল ও শ্রেষ্ঠ উপায় হল পবিত্র কুরআনের অধ্যয়ন। আমাদের শরীর টিকে থাকার জন্য যেমন খাদ্য ও পানির প্রয়োজন হয়, তেমনই আত্মিক জীবনের পুষ্টির জন্য আল্লাহ তা'লা তাঁর প্রেরিত নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর মাধ্যমে আমাদের দান করেছেন এক চিরন্তন আত্মিক আহার– 'পবিত্র কুরআন'।

... অতএব, অশালীন চলচ্চিত্র বা অনুষ্ঠান দেখে কিংবা ইন্টারনেট ও সামাজিকযোগাযোগমাধ্যমে অমূল্য সময় অপচয় না করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করো– তোমরা পবিত্র কুরআন ও এর শিক্ষার জ্ঞান অর্জনে নিজেকে নিয়োজিত করবে। কুরআনকে তোমাদের আত্মশুদ্ধি, চরিত্রগঠন ও আল্লাহ তা'লার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করবে। এ কুরআনই তোমাদেরকে সমাজে কল্যাণকর ও ইতিবাচক ভূমিকা পালনের পথে পরিচালিত করবে। তাই কুরআনের প্রতিটি আয়াত গভীর মনোযোগে পাঠ করো, হৃদয়ে ধারণ করো এবং ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে মূল্য দাও।" (ন্যাশনাল ইজতেমা, মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া, ইউকে, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫)

আপনি কি প্রত্যহ এই দোয়াগুলির পুনরাবৃত্তি করেন?

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاٰلِ مُحَمَّدٍ

অনুবাদ: পবিত্র আল্লাহ্, তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্র; পবিত্র আল্লাহ্, যিনি অতীব মহান। হে আল্লাহ্, রহমত প্রেরণ কর মুহাম্মদ (সা)–এর প্রতি এবং তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি।

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্‌র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি, যিনি আমার পালনকর্তা, এবং আমি অনুতপ্ত হয়ে তাঁরই দিকে ফিরে যাচ্ছি।

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ رَبِّ فَاحْفَظْنِيْ وَانْصُرْنِيْ وَارْحَمْنِيْ

অনুবাদ: হে আমার প্রভু, সমস্ত কিছুই তোমার দাস; অতএব হে আমার প্রভু, আমাকে রক্ষা কর এবং আমাকে সাহায্য কর।

জুমআর খুতবা

আল্লাহ তাআলার কৃপা ও করুণায় আহমদিয়া মুসলিম জামাত প্রজ্ঞা ও সুদৃঢ় যুক্তির সঙ্গে তার বার্তা উপস্থাপন করে–সেই শিক্ষার আলোকে, যা আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ ?–কে প্রদান করেছেন এবং যার ওপর স্বয়ং মহানবী (সা.) আমল করে দেখিয়েছেন। অতএব, সর্বদা এ কথা স্মরণে রাখা উচিত যে আমরা যে–ই তবলীগ বা প্রচার কার্য সম্পাদন করি না কেন, তা অবশ্যই সর্বোত্তম ও সুন্দরতম পদ্ধতিতে করা উচিত।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা–এই আয়াতে যেমন, তেমনি আরও বহু আয়াতে যেখানে তবলীগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে–সেখানে উত্তম পদ্ধতিতে এবং হিকমতপূর্ণ উপদেশের সঙ্গে তবলীগ করার হিদায়াত দিয়েছেন, যাতে তা অন্যদের ওপর প্রভাব ফেলে এবং উপকার সাধিত হয়। যারা এই নীতির ওপর আমল করে, তাদের তবলীগ সর্বদা ফলপ্রসূ হয়, প্রভাব সৃষ্টি করে এবং আল্লাহ তাআলার কৃপায় তারা অনেকাংশে সফলতা অর্জন করে।

একজন মুবাল্লিগ ও আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীকে সর্বদা এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে তবলীগের সঙ্গে বহু অপরিহার্য দায়িত্ব ও শর্ত জড়িত, যা পূরণ করা আবশ্যক। এসব শর্ত পূরণ হলেই তবলীগ সঠিক ও যথার্থ রূপে সম্পন্ন করা সম্ভব।

যারা তবলীগ করতে গিয়ে কখনও কখনও ক্রোধে আক্রান্ত হয়ে বিরোধীদের ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে, তাদের মনে রাখা উচিত যে আমাদের তবলীগ সর্বদা নৈতিকতার সীমার মধ্যেই থাকতে হবে। অন্যরা ভুল ভাষা ব্যবহার করে, কারণ তাদের কাছে শক্তিশালী যুক্তি নেই; কিন্তু যদি আমরাও ভুল ভাষা ব্যবহার করি, তবে তার অর্থ দাঁড়ায়–আমাদের কাছেও কোনো যুক্তি নেই।

কখনও কখনও তবলীগের ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন দেখা যায়, অথচ তবলীগে কোনো প্রকার বাড়াবাড়ির প্রয়োজন নেই। পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সামনে রাখো, হাদিসসমূহকে সামনে রাখো, প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)–এর বাণীকে সামনে রাখো, এবং সে অনুযায়ী তবলীগ করো–এরপর বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দাও।

এমনটি ভাবা উচিত নয় যে আমাদের উদ্দেশ্য অমুক কোনো মৌলভী বা অমুক কোনো আলেমকে তর্কের মাধ্যমে পরাস্ত বা সন্তুষ্ট করা, কিংবা কোনো নির্দিষ্ট বিতার্কিক বা আপত্তিকারীর সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হওয়া। আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো–সত্যিকারের ইসলামের বার্তা বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছে দেওয়া এবং বিশ্বকে এই বিষয়ে নিশ্চিত করা যে এই যুগে প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)–এর আগমন নির্ধারিত ছিল এবং তিনি বাস্তবেই আগমন করেছেন। এ উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। কেবল বিতর্ক, ডিবেট এবং দীর্ঘ প্রশ্নোত্তরে জড়িয়ে পড়ার পরিবর্তে, তবলীগের মাধ্যমে এ বিষয়টি বিবেচনা করা উচিত–কীভাবে আমরা সর্বাধিক মানুষের কাছে সত্যের বার্তা পৌঁছে দিতে পারি এবং তাদের নৈতিক ও আত্মিক সংশোধন সাধন করতে পারি।

মুরব্বিগণের উদ্দেশ্যে আমি বলি–তাদের ওপর এক অত্যন্ত গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। তাদের কাজ কেবল জামাতের তরবিয়ত (নৈতিক ও আত্মিক প্রশিক্ষণ) করা নয়; বরং সেই তরবিয়তের পাশাপাশি ব্যক্তিবিশেষকে আল্লাহ তাআলার সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনে সহায়তা করাও তাদের দায়িত্ব। যেখানে তারা এ কাজটি করবেন, সেখানে তাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি করবেন এবং এই আত্মিক জিহাদের জন্য তাদের প্রস্তুত করবেন। যখন তারা এভাবে দায়িত্ব পালন করবেন, তখনই তারা নিজেদের অঙ্গীকার পূরণকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

পবিত্র কুরআন, হাদিসে নববী (সা.) এবং প্রতিশ্রুত মসীহ (আলাইহিস সালাম)–এর বাণীর আলোকে তবলীগ সম্পর্কিত স্বর্ণালী নির্দেশনা।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত ১২ ডিসেম্বর, ২০২৫, এর জুমুআর খুতবা (১২ ফতাহ, ১৪০৪ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ- اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ○ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ○ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ○ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ○

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ- اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (النحل 126)

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা ও সূরা নাহলের ১২৬ নং আয়াত তিলাওয়াতের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

এর অনুবাদ হলো– তুমি প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে তোমার প্রতিপালক-প্রভুর পথের দিকে আহ্বান জানাও। আর তাদের সাথে এমন যুক্তিপ্রমাণের আলোকে বিতর্ক করো যা সর্বোত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক-প্রভুই তাদেরকে সবচেয়ে ভালো জানেন যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে। আর তিনি হিদায়াত প্রাপ্তদেরও সবচেয়ে ভালো জানেন।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের এই আয়াতে এবং অন্যান্য অনেক আয়াতেও, যেখানে তবলীগ করার (জন্য) নির্দেশ দিয়েছেন, সেখানে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তবলীগ করার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সদুপদেশ দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন, যেন লোকদের ওপর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে এবং তাদের উপকার হয়। আর যারা এর ওপর আমল করেন, তাদের তবলীগ সদা ফলপ্রসূ হয়, কার্যকর প্রমাণিত হয়। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা অনেকাংশে সফলতা লাভ করেন।

অতএব, সর্বদা এই নীতি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। বর্তমানে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কারণে লোকেরা মনে করে, তবলীগ (করা) অনেক সহজ। যারা (তবলীগের) আগ্রহ রাখে তারা গভীর আগ্রহের সাথে একাজ করার চেষ্টা করে।

অনেকেই আছে যারা উন্মুক্ত স্থানে গিয়ে তবলীগ করে। এসব দেশে অনুমতি আছে। পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে তো অনুমতিই নেই, এমনিতেও তবলীগ নিষিদ্ধ। কাজেই যারা তবলীগ করার আগ্রহ রাখে, তারা সেখানে গিয়ে শখ পূর্ণ করে। এটি ভালো উদ্যোগ, কিন্তু তবলীগের জন্যও কিছু শর্ত এবং নিয়মকানুন রয়েছে, যেগুলো সর্বদা দৃষ্টিগোচরে রাখা উচিত, নতুবা উল্টো প্রভাব পড়ে।

যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা এ আয়াতেও উল্লেখ করেছেন। অতএব, এ বিষয়টি অনুধাবন করুন, এরপর তবলীগ করুন। কেননা অনেকে তবলীগ করতে গিয়ে লোকদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে আর ইতিবাচক প্রভাব পড়ার পরিবর্তে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। আবার অনেক সময় জামা'তের ওপর এবং জামা'তের শিক্ষামালার প্রতি অআহমদীরা আপত্তি করার সুযোগ পায়, যা প্রকৃত সত্য ও বাস্তবতা পরিপন্থি।

এছাড়া অনেকে নতুন নতুন এক্ষেত্রে যোগ দেয় এবং মনে করে, আমাদের কাছে খুব অকাট্য দলিল-প্রমাণ আছে; কিন্তু যখন দলিল-প্রমাণ (খুঁজে) পায় না বা বিরোধীদের বশ করতে পারে না, অথবা অকাট্য দলিল দিতে পারে না, তখন নৈরাশ্যের শিকার হয়ে যায়। অথচ নিরাশ হবার কিছু নেই। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের কাছে দলিল-প্রমাণ আছে। তবে কেউ যদি তা বুঝতে না পারে বা বর্ণনা করতে না পারে- সেটি ভিন্ন কথা।

আহমদীয়া জামা'ত যে কথা বলে, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তা প্রজ্ঞা ও দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে বলে এবং সেই শিক্ষার আলোকে বলে থাকে যা আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.) -কে পবিত্র কুরআনে প্রদান করেছেন এবং যার ওপর মহানবী (সা.) স্বয়ং আমল করেছেন। কাজেই, সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত যে, আমাদের সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তবলীগ করতে হবে।

একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ সম্পর্কে, অর্থাৎ তবলীগের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি (আ.) বলেন, আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে যে, আমেরিকা ও ইউরোপে ইসলামের শিক্ষা প্রচারের জন্য কী করা উচিত? এটি কি যুক্তিযুক্ত হবে যে, মুসলমানদের মধ্য হতে কতিপয় ইংরেজী জানা মুসলমান ইউরোপ ও আমেরিকায় গিয়ে বক্তৃতা ও ভাষণের মাধ্যমে ইসলামের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করবে? [যেহেতু ভাষা জানে, তাই তবলীগ করবে?] তিনি বলেন, কিন্তু আমি ঢালাওভাবে কখনো এর উত্তরে 'হ্যাঁ' বলব না। [এটি অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ একটি বিষয়।] যেমনটি তিনি (আ.) বলেন, ইংরেজী জানা অথবা অন্য কোনো ভাষা জানা থাকলেই ধর্মের জ্ঞান অর্জন হয়ে যায় না। বরং এর আরো অনেক অপরিহার্য দিক রয়েছে। যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, এর জন্য জ্ঞান বৃদ্ধি করাও আবশ্যক। এখানেও বিভিন্ন জায়গায় মানুষ তবলীগ করে, কিন্তু বিরোধীদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর, পুরো জ্ঞানভিত্তিক উত্তর দিতে পারে না। একইভাবে যেমনটি আমি পূর্বেও বলেছি, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও একই অবস্থা।

অতএব, প্রথমে সকল দাঈ ইলাল্লাহ্ এবং যারা তবলীগের আগ্রহ রাখেন, তাদের উচিত নিজেদের জ্ঞান বৃদ্ধি করা। সকল আপত্তি একত্রিত করুন। সাধারণত জামা'তের বইপুস্তকে এগুলোর উত্তর রয়েছে, আর যদি না থাকে তাহলে দেশীয় পর্যায়ে তবলীগের যে টিম গঠিত আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করুন, তাদের সাহায্য নিন আর এসব টিমেও যারা জ্ঞান রাখেন, তাদের সাহায্য নিন। যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমি তো কখনো (ঢালাওভাবে) হ্যাঁ-সূচক উত্তর দেবো না। এরপর তিনি (আ.) বলেন, আমি কখনোই এটি যথার্থ জ্ঞান করি না যে, এমন মানুষ যারা ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত নয় এবং এর সুমহান বৈশিষ্টাবলি সম্পর্কে একেবারেই অনবহিত, অধিকন্তু অধুনা কালের সমালোচনাগুলোর খণ্ডনের পুরো বুৎপত্তি রাখে না আর রূহুল কুদুস বা ফেরেশতার সাহায্যে শিক্ষাপ্রাপ্তও নয়, সে আমাদের পক্ষ থেকে মুখপাত্র হিসেবে যাবে। এমনটি হতে পারে না।[মুবাল্লিগ ও তবলীগকারীর জন্য ফেরেশতার সাহায্যে জ্ঞান অর্জন করাও এবং আল্লাহ্র সাথে সম্পর্ক থাকাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়।] তিনি (আ.) বলেন, আমার মুবাল্লিগদেরও আল্লাহ্ তা'লার সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক থাকা উচিত, যেন আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্য করেন। তিনি (আ.) বলেন, আমার মতে, এমন কাজের উপকারিতার চেয়ে অপকারিতা বেশি আর তা দ্রুত প্রকাশ পায়; তবে ব্যতিক্রম থাকতে পারে।

(ইজালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৫১৬-৫১৭)

অর্থাৎ, আমরা এমন কথা বললে এর কল্যাণের চেয়ে অকল্যাণ বেশি হবে, (তবে) আল্লাহ্ চাইলে ব্যতিক্রমও হতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাভজনকও হয়ে থাকে, (এমন) দু -একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। কিন্তু সাধারণত নেতিবাচক প্রভাবই পড়ে। অতএব, একজন মুবাল্লিগ এবং দাঈ ইলাল্লাহ্কে সর্বদা এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত- তবলীগের অনেক আবশ্যকীয় দাবি বা শর্তও রয়েছে, যা আমাদের পূর্ণ করতে হবে। এমনটি হলেই আমরা সত্যিকার অর্থে তবলীগ করতে পারব।

তবলীগের ক্ষেত্রে প্রথম যে বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে তা হলো, ইসলাম একমাত্র ধর্ম এবং মহানবী (সা.) একমাত্র নবী, যিনি পৃথিবীতে আল্লাহ্ তা'লার সেই বাণী নিয়ে এসেছেন যা সমগ্র বিশ্বের জন্য প্রযোজ্য। আর আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে (সা.) সমগ্র মানবজাতি, গোটা বিশ্ব এবং সকল জাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং নবী হিসেবে প্রেরণ করেছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত ইতিহাস (পর্যালোচনা করে) দেখুন! মুসলমানদের সংখ্যা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশের চেয়েও কম। এর কারণ কী? এর কারণ হলো, প্রজ্ঞার সাথে তবলীগ করা হয় নি আর সেই বাণী যথাযথভাবে প্রচার করা হয় নি। মুসলমানরা মনে করে, আমরা জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের বাণী প্রচার করব। অথচ কেবল শত্রুর আক্রমণের ক্ষেত্রেই জিহাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। মুসলমানরা জিহাদের এবং তরবারি ধারণ করার অনুমতি কেবল তখনই লাভ করেছিল যখন কাফিররা কিংবা অমুসলিমরা ইসলামের ওপর আক্রমণ করে একে নির্মূল করতে চেয়েছিল। তখন আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জে বলেন, أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (সূরা হজ্জ: ৪০) অর্থাৎ, সেসব লোক যাদের বিরুদ্ধে বিনা কারণে যুদ্ধ করা হচ্ছে, তাদেরকেও যুদ্ধ করার অনুমতি দেওয়া হলো, কারণ তাদের ওপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাদের সাহায্য করতে সক্ষম। এটাই বড়ো কথা। আর ইতিহাস দেখেছে, ইতিহাস সাক্ষী যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদের সাহায্য করেছেন এবং তাঁর সর্বশক্তিমান হওয়া প্রমাণ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা যখন যুদ্ধের অনুমতি দিয়েছিলেন, তখন একারণেই দিয়েছিলেন যে, অত্যাচার হচ্ছিল। কিন্তু বর্তমান যুগ এ ধরনের জিহাদের যুগ নয়। এখন ধর্মের খাতিরে কোনো যুদ্ধ হচ্ছে না; যদিও বিভিন্ন অজুহাতে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে, কিন্তু (প্রতিপক্ষ কর্তৃক) ধর্মের নাম নেওয়া হচ্ছে না। আল্লাহ্ তা'লাও এবং মহানবী (সা.) -ও পবিত্র কুরআনের জিহাদকেই 'জিহাদে আকবর' বা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (আল ফুরকান: ৫৩)

অতএব এ হচ্ছে মুসলমানদের সাধারণ অবস্থা, যার কারণে আজও মুসলমানরা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশেরও কম।

আমাদের এই বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং নিজেদের দায়িত্ব অনুধাবন করা উচিত যে, আমরা যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি এবং তাঁর সাথে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছি, আমাদের এই বিষয়ের ওপর আমল করতে হবে, অর্থাৎ আমাদের আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে, তাঁর প্রদত্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে এবং এর ওপর আমল করে বিশ্ববাসীর কাছেও এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে।

কিছু লোক সৎ উদ্দেশ্যে কাজ করে, যেমনটি আমি শুরুতে বলেছি; কিন্তু তাদের পূর্ণ জ্ঞান থাকে না অথবা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্কের সেই মান থাকে না যা একজন দাঈ ইলাল্লাহ্ (তথা আল্লাহ্র দিকে আহ্বানকারী)-র হওয়া উচিত। যার ফলে পরবর্তীতে তারা হতাশ হয়ে পড়ে।

এই কথাটি সর্বদা মনে রাখা উচিত যে, মহানবী (সা.)-ও তবলীগের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং বিভিন্ন নির্দেশনা প্রদান করেছেন। হাদীসে অনেক রেওয়ায়েত পাওয়া যায়।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত রয়েছে, আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যেন আমরা মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধিমত্তা বা মেধা অনুযায়ী কথা বলি। (কুনজুল উম্মাল, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০ম ভাগ, পৃ: ১০৫, হাদীস-২৯২৬৮)

প্রথম কথা এটাই যে, যার যতটুকু বুদ্ধি বা জ্ঞান, অথবা সে যে মেজাজ বা ধর্মের অনুসারী, তার সাথে সে অনুযায়ী কথা বলা উচিত।

উদাহরণস্বরূপ, মুসলমানদেরকে যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমন সম্পর্কে জানাতে হয়, তবে তাদের কুরআন, হাদীস এবং তাদের ধর্মীয় বিদ্বানদের পুস্তক থেকে দেওয়া উচিত।

তবলীগকারীদের তিনি (সা.) একথাও বলেছেন,

[এটি একটি দীর্ঘ হাদীস, যার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হলো]-অত্যাচারিত ব্যক্তির বদদোয়া বা অভিশাপ থেকে আত্মরক্ষা করো। তবলীগকারীদের জন্য এটিও অত্যন্ত জরুরি। তার নিজের চরিত্র সবসময় উত্তম ও উন্নত হতে হবে এবং 'হুকুকুল ইবাদ' (বা বান্দার প্রাপ্য) প্রদানের সেই মান থাকতে হবে। অর্থাৎ সে যেন কখনও কোনো অত্যাচারিত ব্যক্তির অভিশাপকে আমন্ত্রণ না জানায়, বরং সর্বদা অত্যাচারিতের দোয়া পায়। যদি সে দোয়া লাভকারী হয়, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তার কাজে বরকত দান করবেন। তিনি বলেন, মযলুমের অভিশাপকে ভয় করা উচিত, কেননা তার ও আল্লাহ্র মাঝে কোনো পর্দা বা আড়াল নেই।

(সহীহ বুখারী, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গাজাব, হাদীস-২৪৪৮)

সুতরাং সর্বদা এই বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আমি যে আয়াতটি পাঠ করেছি, তাতে مَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (উত্তম উপদেশ)-এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মিথ্যা অভিযোগগুলো প্রজ্ঞা ও مَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ-র সাথে দূর করা আল্লাহ্ আমাদের জন্য আবশ্যক করেছেন। আর আল্লাহ্ জানেন,

মহান আল্লাহ্র বাণী

নিশ্চয় আল্লাহ্ তিনি, যিনি পরম রিয্কদাতা, শক্তির অধিকারী, সুদৃঢ়। (আয যারিয়াত: ৫৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rahaman Sb. Berhampur, Murshidabad

উত্তর দেবার সময় আমরা কখনোই নম্রতা ও ধীরস্থির আচরণ পরিত্যাগ করি নি। অর্থাৎ সর্বদা নম্রতার ভিত্তিতে কাজ করেছি। তিনি নিজের অবস্থা সম্পর্কে বলেন যে, আমি তো নম্রতা ও ধীরস্থিরতার সাথে উত্তর দিই। আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষী, এটাই সর্বদা আমার নীতি। সর্বদা নরম ও কোমল শব্দ ব্যবহার করেছি।"

সুতরাং, তবলীগের এই পদ্ধতিই আমাদের অবলম্বন করা উচিত। তাই যারা তবলীগ করতে গিয়ে কখনো কখনো রাগের বশবর্তী হয়ে বিরোধীদের মতো ভাষা ব্যবহার করতে শুরু করে, তাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের তবলীগ যেন নৈতিকতার গণ্ডির মধ্যেই থাকে। তাদের (বিরোধীদের) কাছে কোনো দলিল বা যুক্তি নেই, তাই তারা খারাপ ভাষা ব্যবহার করে। কিন্তু যদি আমরাও খারাপ ভাষা ব্যবহার করি, তবে এর অর্থ হবে– আমাদের কাছেও কোনো দলিল–প্রমাণ নেই।

কেউ কেউ বলে থাকেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–ও কঠোরতা প্রদর্শন করেছেন। প্রথম কথা তো সেটাই যা আমি বর্ণনা করেছি যে, তিনি কঠোরতা করেন নি। আর যেখানে তিনি কঠোরতা করেছেন, সেখানে তিনি লোকদের এই উত্তর দিয়েছেন যে, একমাত্র ব্যতিক্রম হলো, কখনও কখনও বিরোধীদের পক্ষ থেকে অত্যন্ত কঠোর ও নৈরাজ্যকর লেখা পেয়ে নীতিগত কারণে কিছুটা যৌক্তিক কঠোরতা আমরা এই উদ্দেশ্যে অবলম্বন করেছি, যেন জাতি এভাবে তাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেওয়া হয়েছে দেখে নিজেদের বুনো উত্তেজনা দমন করে। [এক্ষেত্রেও তাঁর সদুদ্দেশ্যই ছিল।] আর এই কঠোরতা কোনো প্রবৃত্তির তাড়নায় বা উত্তেজনার বশে ছিল না, বরং নিছক وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ –এই আয়াতের ওপর আমল করে একটি কৌশল হিসেবে তা ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ, এই যে কঠোরতা আমি করেছি, তা অন্তরের কোনো ক্ষোভ থেকে উৎসারিত ছিল না। এটি ছিল একটি শিক্ষা দেবার জন্য। আর দ্বিতীয়ত, মুসলমানদের মধ্যে যারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে, তাদের উত্তেজনা দমানোর জন্য। অর্থাৎ আমি যদি উত্তর দিয়ে দিই, তবে সাধারণ মানুষ বা মুসলমানরা কোনো ভুল পদক্ষেপ নেবে না এবং মারামারিতে লিপ্ত হবে না। তিনি বলেন, আর সেটিও তখন করা হয়েছে যখন বিরোধীদের অপমান, তুচ্ছতাচ্ছিল্য ও গালিগালাজ চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। আমার যেসব লেখায় কঠোর শব্দ দেখা যায়, তা সেই সময় তাদের বিরোধিতার কারণে ও তাদের গালিগালাজের কারণে করা হয়েছে। কেন করেছেন? যখন ইসলাম এবং মহানবী (সা.)–এর প্রতি তাদের অপমান, উপহাস ও গালিগালাজ চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল, যখন তারা তা চরম পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল, তখন করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের নেতা ও মনীব, বিশ্বজাহানের সরদার, সৃষ্টিকুলের গৌরব (সা.)–এর নামে ওই লোকেরা এমন নোংরা ও দুষ্কৃতিমূলক শব্দ তারা ব্যবহার করেছে যে, এর ফলে শান্তিশৃঙ্খলা হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। তাই সেই সময় আমরা এই কৌশল অবলম্বন করেছি।"

(আল বালাগ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–১৩, পৃ: ৩৮৫)

সুতরাং তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে কঠোর শব্দ ব্যবহার করা থেকে জামা'তকে বারণ করেছেন এবং এটাই বলেছেন যে, কিছু জায়গায় আমি এই শব্দগুলো কিছু বাধ্যবাধকতার কারণে ব্যবহার করেছি, কিন্তু তোমাদেরকে নম্রতা অবলম্বন করতে হবে, তোমাদের কঠোর শব্দ ব্যবহার করলে চলবে না। আর তিনি এই কঠোরতায় তাদের ইতিহাসের বরাত দিয়ে কথা বলেছেন, তাদের মতো গালিগালাজ এবং নোংরা ভাষা ব্যবহার করেন নি।

অনুরূপভাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমাদের জন্য পবিত্র কুরআনে নির্দেশ হলো, وَ لَا تُجَادِلُوْۤا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ (সূরা আনকাবুত: ৪৭)। এটি সূরা আনকাবুতের আয়াত। এর অর্থ হলো, উত্তম পন্থা ব্যতিরেকে আহলে কিতাবের সাথে বিতর্ক করো না। এছাড়া অন্যত্র তিনি বলেন, এটাও আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ যে, اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ (সূরা আন–নাহল: ১২৬)। এর অর্থ হলো, উত্তমভাবে এবং এমন পদ্ধতিতে খ্রিষ্টানদের সাথে বিতর্ক করা উচিত যা কল্যাণকর। প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি এবং এমন হিতাকাঙ্ক্ষামূলক রীতি অবলম্বন করা উচিত যেন তাদের উপকার হয়। আর এই নীতিই প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের ক্ষেত্রে তবলীগকারী বা প্রচারকারীর জন্য প্রযোজ্য, তা সে ইহুদী হোক, খ্রিষ্টান হোক, হিন্দু হোক অথবা আজকাল মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–কে মুসলমান মনে করে না– তাদেরকে তবলীগের জন্যও এই একই উপদেশ প্রজোয্য। তিনি বলেন, আমরা সরকারের সাহায্য নিয়ে কিছু করব অথবা নাউযুবিল্লাহ্ নিজেরাই উত্তেজনা প্রদর্শন করব– এটা ভুল পদ্ধতি, যা আমাদের মূল উদ্দেশ্য অর্জনে মোটেও উপকারী নয়। এগুলো পার্থিব ঝগড়াবিবাদের দৃষ্টান্ত এবং প্রকৃত মুসলমান ও ইসলামী রীতিনীতি সম্পর্কে অবহিত লোকেরা কখনোই এগুলো পছন্দ করেন না; কারণ এর দ্বারা মানবজাতির হিদায়াতের জন্য উপকারী ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে না।""

(কিতাবুল বারিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–১৩, পৃ: ৩১৭–৩১৮)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)–ও তফসীরে কবীরে اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ –এর ব্যাখ্যা করেছেন।

তিনি অভিধানের দিক থেকে হিকমত বা প্রজ্ঞার অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, হিকমতের অর্থ 'হিলম' বা নম্র তাও হয় এবং এর মানে হলো, নম্রতার সাথে এবং বিবেকবুদ্ধি খাটিয়ে কথা বলা।

আল্লাহ্ তা'লা একথা বলেছেন কারণ যে ব্যক্তি এমনটা করে না, সে দ্রুত উত্তেজিত হয়ে রাগান্বিত ও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে, ফলে সে অন্যকে কখনোই বোঝাতে পারে না।

একইভাবে হিকমতের একটি অর্থ নবুওয়ত, আর এ অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এর অর্থ হবে– আল্লাহ্‌র কালাম বা ঐশীবাণীর সাহায্যে মানুষকে ধর্মের দিকে আহ্বান করো। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা যে কালাম দিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআন নিজে যেসব দলিল উপস্থাপন করেছে সেগুলোই উপস্থাপন করো, নিজের পক্ষ থেকে মনগড়া কথা উপস্থাপন কোরো না। তিনি বড়ো আক্ষেপের সাথে বলেছিলেন, মুসলমানরা যদি এই রহস্য বুঝত তবে তারা ইহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মকে গ্রাস করে ফেলত (পরাজিত করত)। আমাদের হাতিয়ার হলো পবিত্র কুরআন, যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন: ***'ওয়া জাহিদ্‌হুবিহিম'*** – এই কুরআনের তরবারি নিয়ে দুনিয়ার সাথে জিহাদের জন্য বেরিয়ে পড়ো। কিন্তু পরিতাপ, আজ জাগতিক সবকিছু মুসলমানদের হাতে রয়েছে, অর্থাৎ যারা ধনী দেশ– তাদের; কিন্তু যদি কিছু না থাকে তবে তা হলো সেই তরবারি যা নিয়ে বেরিয়ে পড়ার আল্লাহ্ তা'লা নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ তবলীগের জন্য পবিত্র কুরআনের দলিল নিয়ে বের হও। তেলের সম্পদ আছে, অনেক ব্যাবসাবাণিজ্য আছে, মু সলমানদের অনেক দেশ রয়েছে। মুসলমানদের চুয়ান্নটি দেশ আছে, কিন্তু ইসলামী শিক্ষায় সজ্জিত হয়ে যেভাবে জিহাদ করা উচিত ছিল, তারা সেভাবে করে নি।

তারপর তিনি অভিধানের দৃষ্টিকোণ থেকে বলেন, হিকমতের একটি অর্থ হলো এমন কথা বলা যা মূর্খতা থেকে বিরত রাখে।

এখন এর পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে, তোমরা এমন পদ্ধতিতে কথা বলো যা অন্যজন বুঝতে পারে এবং যার মাধ্যমে তার ভুল ধারণা দূর হতে পারে। অর্থাৎ এমন কথা হওয়া উচিত যা মূর্খতার মূলোৎপাটন করে এবং সম্বোধিত ব্যক্তির জ্ঞানবুদ্ধিসম্মত হয়। যেমন হাদীসেও এসেছে: امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان نکلم الناس علی قدر عقولھم অর্থাৎ মহানবী (সা.) আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা মানুষের সাথে তাদের বোধবুদ্ধি ও জ্ঞান অনুসারে কথা বলি। যেমনটি আমি পূর্বেও হাদীসের উল্লেখ করেছি। কিছু লোক বক্তৃতা দেওয়ার সময় কঠিন কঠিন শব্দ ও পরিভাষা ব্যবহার করে প্রতাপান্বিত করতে চায়। এসব বক্তৃতার মাধ্যমে হয়ত মূর্খদের ওপর প্রভাব পড়ে ঠিকই, কিন্তু এসব বক্তৃতার দ্বারা কেউ লাভবান হয় না। এখন এখানেও এমনটিই হয়। আমরা যখন অন্যদের সাথে বা কখনো আলেমদের সাথে কথা বলি, তারাও এই ধরনের কথা বলতে থাকে; কিন্তু যদি আমরাও সেভাবেই কথা বলি– তবে তাদের লাভ হবে কি না জানি না, কিন্তু সাধারণ মানুষ আসল বিষয়টি বুঝতে পারে না। তারা কেবল বাগাড়ম্বরের আবর্তে পড়ে থাকে। যখন সহজ ভাষায় বোঝাবেন তখন হতে পারে শ্রোতাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকবে যারা সহজ ভাষায় কথাটি বুঝতে পারবে এবং তারা ঐ বাগাড়ম্বরদের পরিবর্তে আপনার কথা শুনে তাতে বেশি মনোযোগ দিতে চাইবে।

এরপর তিনি বলেন, সত্যসম্মত কথাকেও হিকমত বা প্রজ্ঞা বলে। এটিও অভিধানে লেখা আছে। এই অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে এই আয়াতের অর্থ হবে, এমন কথা বলো যা সত্য এবং বাস্তবসম্মত। কিছু লোক সত্য ধর্মের দিকেই ডাকতে গিয়ে কিছু ভুল কথাও বলে ফেলে।

অনেক সময় মানুষের দ্বারা তবলীগে অতিরঞ্জন হয়ে যায়, অথচ তবলীগে কোনো অতিরঞ্জনের প্রয়োজন নেই। পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে সামনে রাখুন, হাদীস সামনে রাখুন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর বাণী সামনে রাখুন এবং তবলীগ করুন, আর তারপর বিষয়টি আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দিন।

তিনি বলেন, ভুল কথা বর্ণনা করার এই পদ্ধতিটিই ভুল। শত্রুর মোকাবেলায় যা বলবে সত্য বলবে। অন্যদের হিদায়াত দিতে দিতে নিজেই পথভ্রষ্ট হয়ে যেও না। যেমনটি আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন: لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ অর্থাৎ, যদি তোমরা হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো তবে এর পরোয়া কোরো না যে, অন্য কেউ পথভ্রষ্ট হচ্ছে কি না। (আল মায়েদা: ১০৬) অন্যের পথভ্রষ্টতা তোমাদের কোনো ক্ষতি করবে না। নিজেকে রক্ষা করো। অর্থাৎ এমন কোনো কাজ যা পাপ বা ভুল– তা এই ভেবে কোরো না যে, এর মাধ্যমে আমি অন্যকে সৎপথ দেখাবো। যখন তোমার নিজের হিদায়াত এবং অন্যকে হিদায়াত দেবার বিষয়টির সংঘর্ষ হয় তখন তুমি তোমার নিজের হিদায়াতের কথা চিন্তা করো এবং অন্যের হিদায়াত আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দাও। কারণ আল্লাহ্ তা'লা চান না যে, কোনো মু'মিন কাফির হয়ে যাক এবং কোনো কাফির মু'মিন হয়ে যাক। তিনি তো অন্যদেরকে সৎপথ দেখাতে চান।

এরপর তিনি এই 'হিকমত' শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অভিধানের সূত্র ধরে এ–ও বলেছেন যে, স্থানকাল অনুযায়ী যথাযথ কথা বলাকেও 'হিকমত' বলে।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী

তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, যাহাকে মানবজাতির (কল্যাণের) জন্য উত্থিত করা হইয়াছে। তোমরা ন্যায় সঙ্গত কাজের আদেশ দিয়া থাক এবংঅসঙ্গত কাজ হইতে বারণ করিয়া থাক এবং আল্লাহতে ঈমান রাখ। (আলে ইমরান:১১১)

দোয়াপ্রার্থী: Late Sawkat Ali Molla & Jahanara Bibi
From-Sabina Parveen. Banshra, 24 PGS (S)

এই অর্থের ভিত্তিতে আয়াতটির অর্থ হবে, তবলীগের সময় অবস্থানুযায়ী কথা বলা উচিত। যদি কোনো যুক্তির কারণে শত্রুর উত্তেজিত হওয়ার ও রাগান্বিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে আর এই ভয় থাকে যে, সে এভাবে তোমার কথা শুনবে না– তবে অকারণে তাকে খেপানো উচিত নয়। তুমি তার সামনে অন্য যুক্তিগুলো তুলে ধরো, যা সে শান্ত মনে শুনতে পারে। অর্থাৎ কথা বলার সময় প্রথমে মানুষের মেজাজ মর্জি বুঝে নাও। তুমি যদি অকারণে তাদেরকে উত্তেজিত করো, তবে এমন তবলীগের ফলে কোনো লাভ হবে না। শুধুমাত্র নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য এবং এটা বলার জন্য যে, আমরা সত্য, মসীহ্ মওউদ সত্য, ইসলাম সত্য আর নিঃসন্দেহে হযরত মুহাম্মদ (সা.) সমস্ত পৃথিবীর জন্য নবী– এই কথাগুলো যদি প্রমাণ ছাড়া বলো, তবে কেবল উত্তেজনা সৃষ্টি হবে। প্রজ্ঞার সাথে কথা বলো, যেন মানুষ একথাগুলো বুঝতে পারে।

সুতরাং এটাই সৌন্দর্য, সংক্ষিপ্ত শব্দের মাঝে আল্লাহ্ তা'লা তবলীগের সমস্ত মূলনীতি বর্ণনা করে দিয়েছেন। আর এটাই সেই পদ্ধতি যার ওপর আমরা তবলীগকারীরা আমল করলে ইনশাআল্লাহ্ সফলতাও পাবো।

مَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ অর্থ হলো সেই কথা যা অন্তরকে নরম করে এবং হৃদয়ে গভীর প্রভাব ফেলে। এই উপদেশের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে এ দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করা হয়েছে যে, শুধুমাত্র নিরস যুক্তি দিয়ে কাজ চালিয়ে যেও না।

বর্তমানে আহমদীয়া জামা'তের দায়িত্ব হলো, ইসলামের এই বার্তা বিশ্বকে জানানো। বিরোধী বা প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে যাদের সাথেই কথা হয়, তাদের প্রত্যেককে এটা বলা উচিত যে, ধর্মে কেবল নিরস যুক্তিনির্ভর নয়, বরং উপদেশের বিভিন্ন দিক রয়েছে যা মেনে চলা উচিত। এরপর তিনি (আ.) বলেন, আবেগ জাগানিয়া কথাবার্তাও বলো এবং হিকমতের পাশাপাশি مَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ – কেও দৃষ্টিপটে রাখো। আর 'হাসানা' শব্দটি ব্যবহার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, মিথ্যা আত্মসম্মানবোধে আঘাত করবে না, যেভাবে বর্তমানকালের মূর্খ আলেমরা অকারণে মানুষকে সত্য ও সততার বিরুদ্ধে উসকে দেয়। وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ (অর্থাৎ আর তাদের সাথে এমনভাবে বিতর্ক করো যা সবচেয়ে উত্তম)– বলে বোঝানো হয়েছে যে, তাদের সাথে তর্ক করার সময় অর্থাৎ আলোচনার সময় বিভিন্ন যুক্তির মধ্যে যেটি সবচেয়ে উত্তম এবং শক্তিশালী যুক্তি, সেটিকে ভিত্তি ও কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে উপস্থাপন করো এবং বাকি যুক্তিগুলোকে এর অধীন রাখো, কেননা সহায়ক যুক্তি খণ্ডিত হলেও মূল যুক্তিতে কোনো আঁচড় পড়ে না। এর বিপরীতে যদি মূল বিষয়টি দুর্বল হয়, তবে শক্তিশালী সহায়ক যুক্তিও কোনো কাজে আসে না।

এরপর আল্লাহ্ তা'লা বলেন: اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (সূরা আননাহল: ১২৬) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক-প্রভুই তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত ব্যক্তিকে সবচেয়ে বেশি জানেন এবং হিদায়াতপ্রাপ্তদেরও তিনিই সবচেয়ে বেশি জানেন। সুতরাং এখানে বলা হয়েছে যে, তোমরা ভালোভাবে তবলীগ করতে থাকো, কিন্তু যদি মানুষ গ্রহণ না করে, তবে এর এই অর্থ করে হতাশ হয়ে যেও না যে, আমরা তবলীগ করতেই জানি না। কেননা, হতে পারে তোমাদের প্রচারে কোনো ত্রুটি নেই, কিন্তু সম্বোধনকৃত ব্যক্তির হৃদয়ে তার পাপের এমন মরিচা জমে আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য হিদায়াতের জানালা খুলছেন না। মোটকথা, তবলীগের কাজে মগ্ন থাকা উচিত। এটাই মূল বিষয়। আমাদের কাজ হলো প্রচার চালিয়ে যাওয়া। ফলাফল প্রকাশ করা এবং প্রভাব সৃষ্টি করা আল্লাহ্ তা'লার কাজ। (তফসীরে কবীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭১-২৭৪)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, অনেকেই মৌলবী ও আলেম হবার দাবি নিয়ে মিম্বরে চড়ে, নায়েবে রসূল এবং নবীদের উত্তরাধিকারী হওয়ার দাবি করে ওয়ায করে বেড়ায়। তারা মুখে বলে, অহংকার, দাম্ভিকতা এবং পাপাচার থেকে বেঁচে চলো। কিন্তু তাদের নিজেদের কর্মকাণ্ড ও আচরণ– যাতে তারা লিপ্ত, তা এ বিষয় থেকেই বুঝা যায় যে, তাদের কথাবার্তার ফলে তোমাদের হৃদয় কতটা প্রভাবিত হয়! সৎ প্রকৃতির ব্যক্তিদের ওপর তাদের প্রভাব কতটুকু! অতএব এই মৌলবীদের তবলীগের প্রভাব যদি তোমাদের ওপর না পড়ে তাহলে নিজেদের অবস্থা চিন্তা করে দেখো। তোমরাও যদি একই কথা বলো, তবে তোমাদের কথার কী-ইবা প্রভাব পড়বে! এ থেকে উপলব্ধি করো যে, তোমরা যদি তবলীগ করে থাকো তাহলে সর্বপ্রথম নিজেদের আমল ঠিক করা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলা আবশ্যক। এমনটি যদি হয় তবেই তোমাদের তবলীগ সঠিক, সফল এবং ফলপ্রসূ হবে। তিনি (আ.) বলেন, এসব লোক যদি কর্মশক্তিতে বলিয়ান হতো এবং বলার পূর্বে নিজে করে দেখাতো, তাহলে পবিত্র কুরআনে لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ (সূরা সাফ: ০৩) (অর্থাৎ তোমরা এমন কথা কেন বলো যা নিজে করো না?)– বলার কী প্রয়োজন ছিল? আল্লাহ্ তা'লার কী প্রয়োজন ছিল পবিত্র কুরআনে لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ বলার? এ আয়াতই প্রমাণ করছে যে, উপদেশ দিয়ে নিজে আমল না করার দলের মানুষ পৃথিবীতে পূর্বেও ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সুতরাং এটি এ বিষয়ের প্রমাণ যে, এমন লোক সর্বদাই থাকবে যারা তবলীগ করে এবং তাদের দলিলপ্রমাণ শুনে মানুষ কখনো কখনো প্রভাবিত হয় ঠিকই, কিন্তু যখন তাদের ব্যবহারিক আচরণ দেখে তখন দূরে সরে পড়ে। তাই তোমরা যদি তবলীগ করতে চাও তাহলে তোমাদের কথা এবং কাজে মিল রাখো। তবেই তোমাদের তবলীগ সফল হবে এবং তাতে কল্যাণও লাভ হবে।

অতঃপর তিনি (আ.) বলেন, "তোমরা আমার কথা মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং ভালোভাবে স্মরণ রাখো, মানুষের কথাবার্তা যদি হৃদয় থেকে উৎসারিত না হয় এবং তা যদি কর্মবলে সজ্জিত না হয় , তবে তা প্রভাববিস্তারী হয় না। এ কারণেই তো আমাদের মহানবী (সা.)-এর মহান সত্যতা প্রতিভাত হয়, কেননা যে পরিমাণ সফলতা এবং (মানুষের) হৃদয়ে যতটা প্রভাব বিস্তারে তিনি সক্ষম হয়েছেন, অর্থাৎ যেভাবে তিনি সফল্য লাভ করেছেন আর মানব হৃদয়ে যেভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন– এর কোনো দৃষ্টান্ত মানবেতিহাসে পাওয়া ভার। আর এ সবকিছু হওয়ার কারণ হলো, তিনি (সা.) কথা ও কাজে এক ও অভিন্ন ছিলেন।"(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৭,৬৮)

অতএব আমরা যদি তবলীগের কাজ করতে চাই এবং সংবাদ পৌঁছাতে চাই, তাহলে আমাদের এই পদ্ধতির ওপর আমল করতে হবে। মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা মেনে চলতে হবে এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে বিশেষ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।

لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ বিষয়ে আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) অপর একস্থানে বলেন, মু'মিনের দ্বিমুখী আচরণ করা উচিত নয়। সর্বদা নিজেদের কথা এবং কাজকে ঠিক রাখো এবং এর মাঝে সমতা বজায় রাখো। যেভাবে সাহাবীরা নিজ জীবনে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে দেখিয়েছেন, তেমনিভাবে তোমরাও তাঁদের (রা.) পদাঙ্ক অনুসরণ করে নিজেদের সত্যনিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার নমুনা উপস্থাপন করো। কেবল তবেই তোমাদের তবলীগ বরকতমণ্ডিত হবে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৪)

শুধুমাত্র এটি মনে করা যে, আমাদের কাছে মিডিয়া সহজলভ্য হয়ে গেছে, আমরা (এর মাধ্যমে) তবলীগ করব– এভাবে তো তবলীগের ফলাফল সৃষ্টি হতে পারে না।

এরপর وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) একস্থানে এভাবে বলেন, যাকে উপদেশ দিতে হবে তাকে মৌখিকভাবে উপদেশ দাও। অর্থাৎ কথার মাধ্যমে উপদেশ দিতে হবে। একই কথা একভাবে উপস্থাপন করা কোনো ব্যক্তিকে শত্রু বানিয়ে দিতে পারে, আবার ভিন্নভাবে উপস্থাপন তাকে বন্ধু বানাতে পারে। শব্দ তো একই, একই কথা বলাটাই উদ্দেশ্য; কিন্তু সেটিই এক আঙ্গিকে বললে মানুষ শত্রু হয়ে যায়, আর কোমল ভাষায় যদি বলা হয় তাহলে মানুষকে বন্ধু বানিয়ে দেয়। অতএব নিজেদের কাজ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ নির্দেশ অনুসারে করো। এই পদ্ধতিতে কথা বলাকেই আল্লাহ্ তা'লা 'হিকমত' নামে অভিহিত করেছেন। এজন্যই তিনি বলেছেন, يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَّشَآءُ (আল-বাকারা: ২৭০) (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১২৭)

অর্থাৎ তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন। এরপর তিনি (আ.) বলেন, ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যতা প্রকাশের জন্য সর্বপ্রথম দিক হলো, তোমরা আদর্শ মুসলমান হয়ে যাও। " (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩২৩)

অতএব এটিই হলো সর্বপ্রথম বিষয়। এটি কোনো কৃতিত্ব নয় যে, আমরা তবলীগ করেছি অথবা আমরা তাদের কাছে বার্তা পৌঁছিয়েছি। বার্তা পৌঁছানোর পাশাপাশি আমাদের এটিও দেখতে হবে যে, আমরা আমাদের মাঝে কী পরিবর্তন সাধন করেছি। শুধুমাত্র সংবাদ পৌঁছানোই যথেষ্ট নয়। এতটুকু নিয়েই গর্ব করা উচিত নয় যে, আমরা আহমদী হয়েছি, আমরা তবলীগ করেছি এবং দাঈ ইলাল্লাহ্ তালিকায় আমাদের নাম উঠেছে। না, বরং তিনি (আ.) বলেন, সর্বপ্রথম দিক হলো, তোমরা আদর্শ মুসলমান হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করো।আর দ্বিতীয় দিক হলো, এর অনন্য বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলি পৃথিবীতে বিস্তৃত করো। হ্যাঁ, এরপর (তোমরা) যখন উত্তম আদর্শে পরিণত হবে, অতঃপর পৃথিবীতে প্রচার করবে– তখনই দেখো, কী বিপ্লব সাধিত হয়! যে বিপ্লব পৃথিবীতে সম্পদশালীরা সৃষ্টি করতে পারে নি, তা তোমরা সৃষ্টি করবে।

যারা কয়েক দিন তবলীগ করে মনে করেন যে, কোনো ফল আসলো না– তাদের সম্পর্কেও তিনি (আ.) বলেন, কথা বলার সময় ভেবেচিন্তে

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" তুচ্ছ এ জীবন যাকে নিয়ে এত গর্ব করা হয়। চিরন্তন আনন্দের জীবন সেটিই যা মৃত্যুর পর লাভ হয়।"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৬)

দোয়াপ্রার্থী: **Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)**

যুগ ইমামের বাণী

ইসলামের সুরক্ষা এবং সত্যের উদ্ঘাটনের জন্য সর্বপ্রথম তোমরা প্রকৃত মুসলমানের নমুনা হয়ে দেখাও।

(মালফুযাত , ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬১৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)**

এবং সংক্ষিপ্তাকারে কাজের কথা বলা উচিত। দীর্ঘ বিতর্ক করে কোনো লাভ নাই। কখনো কখনো সুযোগে ছোট্ট কোনো একটি বাক্য বলবে যা সরাসরি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করবে। পরে আবার সু যোগ পেলে বলো। [এটি অবিচল মনোভাব নিয়ে তবলীগ করার বিষয়।] মোটকথা, ধীরে ধীরে সত্যের বার্তা পৌঁছানো অব্যাহত রাখতে হবে; ক্লান্ত যেন না হয়। [এটি আমাদের কাজ, ক্লান্ত হলে চলবে না। এমন নয় যে, আমরা একদিন ক্যাম্প বা স্টল দিলাম এবং তবলীগ করলাম আর এরপর কাজ শেষ হয়ে গেল।] না, কেননা বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাকে লোকজন পাগলামি মনে করে। তিনি (আ.) বলেন, বর্তমানে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়াকে পাগলামি মনে করা হয়। সাহাবীরা যদি বর্তমান যুগে থাকতেন তবে লোকেরা তাদেরকে উন্মাদ বলত এবং তারা তাদেরকে কাফির বলত। দিবানিশি অনর্থক বিষয়াবলি, বিভিন্ন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শন এবং পার্থিব ভাবনায় মগ্ন থাকার ফলে হৃদয় কঠিন হয়ে যায় এবং কথার প্রভাব বিলম্বে পড়ে।

আজকাল তো পৃথিবীতে আরো বেশি জগৎপূজারি মানুষ রয়েছে। তিনি (আ.) যে যুগে একথা বলেছিলেন সে যুগের তুলনায় বর্তমানে বস্তুবাদিতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। পার্থিবতায় নিমজ্জিত আছে। তাদের ওপর কী-ইবা প্রভাব পড়বে! তাই এটি মনে করবেন না যে, আমরা অমুক মৌলবী বা অমুক আলেমকে তবলীগ করে তাকে মান্য করাবো অথবা অমুক বিতার্কিককে বা আপত্তিকারীকে তবলীগ করব। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীতে ইসলামের প্রকৃত বার্তা পৌঁছানো এবং পৃথিবীকে একথা মানানো হলো যে, এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের কথা ছিল এবং তিনি এসে গেছেন। এজন্য আমাদের চেষ্টাপ্রচেষ্টা করা উচিত। শুধুমাত্র বিতর্ক আর দীর্ঘ প্রশ্নোত্তরে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে এটি দৃষ্টিপটে রাখুন যে, তবলীগের মাধ্যমে আমরা কীভাবে বেশি বেশি মানুষের কাছে সত্যের বার্তা পৌঁছাতে পারব এবং তাদের সংশোধন করতে পারব।

সাহাবীরাও এটি করেছিলেন। তারা তবলীগ করতেন, কিন্তু বর্তমানে যেহেতু মানুষ পার্থিব চিন্তাভাবনায় নিমজ্জিত আছে এবং তাদেরকে বোঝানো বড়োই কষ্টসাধ্য, তাই অত্যন্ত প্রজ্ঞার সাথে তাদেরকে বোঝাতে হয়। আবার একই কথা বলা হচ্ছে যে, যদি আমাদের ব্যবহারিক কর্মকাণ্ড আদর্শিক হয় তবে লোকদের দৃষ্টিও স্বাভাবিকভাবে আমাদের দিকে আকৃষ্ট হবে।

তিনি (আ.) নিজের একটি উদাহরণ উপস্থাপন করেন যে, এক তহশিলদার ছিল। সে আমার সাথে বাহাস করত। আমি তাকে নসীহত করতাম। সে আমাকে উপহাস করত। আমিও তাকে পরিত্যাগ করি নি। আমি বলি, তোমাকে ছাড়ব না। তোমাকে বলতেই থাকব, উপদেশ দিতই থাকব। হয়ত তিনি (আ.) তার মাঝে কোনো পুণ্য স্বভাব দেখে থাকবেন। যাইহোক তাকে অবিচলতার সাথে বুঝাতে থাকি। অবশেষে এমন এক সময় উপস্থিত হলো যে, সে হাউমাউ করে কাঁদতে আরম্ভ করে এবং আমার কাছে ক্ষমা চাইতে থকে। [একটি সময় এমন ছিল যখন হাসি, ঠাট্টাবিদ্রুপ করত, আর পরবর্তীতে কান্নায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়; এমনকি কান্না শুরু করে দেয়।] অতএব তিনি (আ.) বলেন, অনেক সময় পুণ্যবানকেও দুর্ভাগা ও অভাগা মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে পুণ্যবানই হয়ে থাকে। তার পেছনে লেগে থেকে তার বোধশক্তি অনুযায়ী এবং প্রজ্ঞার সাথে কথা বলতে থাকলে একসময় সে বুঝতে সক্ষম হয়। তিনি (আ.) বলেন, স্মরণ রাখবে, প্রত্যেক তালার একটি নির্দিষ্ট চাবি রয়েছে। [অর্থাৎ প্রত্যেকটি তালা খোলার জন্য একটি চাবি থাকে।] কথা বলার ক্ষেত্রেও একটি চাবি রয়েছে, আর সেটি হলো- সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন। [সঠিক পদ্ধতিতে কথা বলা উচিত।]

তিনি (আ.) বলেন, যেভাবে অনেক ওষুধের মধ্যে একটি ওষুধ একজনের জন্য কার্যকরী হয়ে থাকে এবং অপরজনের জন্য ভিন্ন ঔষধ কার্যকরী সাব্যস্ত হয়ে থাকে, তদ্রুপ প্রত্যেকটি কথা কোনো বিশেষ ভঙ্গিতে বা শৈলিতে কোনো ব্যক্তিবিশেষের জন্য কার্যকরী সাব্যস্ত হতে পারে। এমন যেন না হয় যে, সবার সাথে একই ধাঁচে কথা বলবে। তবলীগকারীর উচিত, কারো মন্দ কথায় যেন উত্তেজিত না হয়, বরং নিজের কাজ যেন অব্যাহত রাখে এবং ক্লান্ত না হয়। ধনী ব্যক্তিদের প্রকৃতি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে থাকে আর তারা জগৎ সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকে। অনেক কথা তারা সহ্য করতে পারে না। তাদেরকে বিশেষ কোনো সময়ে বিশেষ ধাঁচে এবং অত্যন্ত বিনম্রভাবে উপদেশ প্রদান করা উচিত। (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১১৯-১২০)

সকল শ্রেণির মানুষকে উপদেশ প্রদান করতে হবে; ধনীদেরকেও এবং দরিদ্রদেরকেও। ধনী ব্যক্তিদেরকে তবলীগ করার কৌশল সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী তাদেরকে নসীহত করবে। তিনি (আ.) এ সম্পর্কে হযরত ইবনে আরাবী (রহ.)-র উদাহরণ দিয়েছেন যে, ইবনে আরাবী লিখেছেন, "আল্লাহ্ তা'লা হযরত মূসা (আ.)-কে ফেরাউনের প্রতি বিনম্র আচরণ করার নির্দেশ কেন দিয়েছিলেন? এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব হলো, আল্লাহ্ তা'লা অবগত ছিলেন- পরিশেষে সে ঈমান আনার সৌভাগ্য লাভ করবে। তিনি (ইবনে আরাবী) লেখেন, 'আমানতু ' শব্দ তার মুখ থেকেই উচ্চারিত হয়েছে। (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ২৩২)

অবশেষে যখন সে মৃত্যুর মুখে নিপতিত হচ্ছিল এবং নিমজ্জিত হচ্ছিল তখন সেই এই শব্দই উচ্চারণ করেছিল যে, 'আমানতু' (অর্থাৎ আমি ঈমান আনছি)। "

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) তবলীগের পদ্ধতি সম্পর্কে হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেন যে, হযরত ইউসুফ (আ.)-কে যখন কারাগারে প্রেরণ করা হয় তখন সেখানে আরো দুইজন কয়েদি ছিল। এ বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (রা.) লেখেন, হযরত ইউসুফ (আ.) নিজের দিকে তাদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য এক অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করেন। যেহেতু এই আশঙ্কা ছিল যে, তবলীগ করলে তারা অধৈর্য হয়ে পড়বে, এ কারণে প্রথমে তাদেরকে এই নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, আমি (তোমাদের কাছ থেকে) বেশি সময় নেব না, বরং খাবার আসার পূর্বেই তোমাদের ছেড়ে দেবো। এমনটি করার কারণ হলো, তারা যেন অধৈর্য না হয় এবং মনোযোগ সহকারে কথা শোনে। সম্ভবত হযরত ইউসুফ (আ.) তবলীগ করার সুযোগ পেতেন না। তাই তিনি তাদের প্রশ্নকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন। [অর্থাৎ বন্দিরা যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিল।] আর তিনি (আ.) ভেবেছিলেন যে, তাদের চাহিদা পূর্ণ করার পূর্বেই তাদেরকে তবলীগ করব, তাহলে তারা শুনতে বাধ্য হবে।

অতঃপর তিনি (রা.) মহানবী (সা.)-এর উদাহরণ দেন। [শুধু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দৃষ্টান্ত নয়। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর একটি দৃষ্টান্ত তো দিয়েছেন, আর অপরটি ছিল মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টান্ত।] প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা.) যখন নিজ দাবি উপস্থাপন করেন আর তিনি (সা.) যখন মক্কার অধিবাসীদেরকে তবলীগ করতে চাইতেন, তখন তারা উপেক্ষা করে চলে যেত এবং তবলীগ (বিষয়ক কথা) শুনত না। অবশেষে তিনি (সা.) একটি নিমন্ত্রণের আয়োজন করেন এবং খাবারদাবার খাইয়ে তবলীগ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু (খাওয়া শেষে) তারা উঠে চলে যায়। এতে তিনি (সা.) এই উপায় অবলম্বন করলেন যে, পুনরায় তাদেরকে দাওয়াত দিলেন এবং খাবার আসার পূর্বে তাদেরকে নিজের দাবি সম্পর্কে অবগত করলেন। তারা খাবারের অপেক্ষায় সেখানে বসে থাকতে বাধ্য ছিল, এ কারণে তিনি (সা.) তাদেরকে কথা শোনানোর সুযোগ পেয়ে যান।

উপরোক্ত আয়াত থেকে নবীদের উপদেশ প্রদানের পদ্ধতিও জানা যায়। সুতরাং তাদের অনুসরণে ওয়ায-নসীহত করার সময় সদা স্মরণ রাখা উচিত, কথাও যেন বলা হয়, আবার সে কথা যেন অন্যদের জন্য কষ্টের কারণও না হয়। অর্থাৎ একটি নীতিগত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, এমনভাবে কথা বলবে যা সঠিকও হবে, কিন্তু এমনভাবে বলবে যেন অন্যের জন্য তা কষ্টকর না হয়। অতএব প্রজ্ঞার সাথে কথা বলা উচিত আর এ বিষয়টি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

(সূত্র: তফসীরে কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১২-৩১৩)

যুগ খলীফার বাণী

প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। এবং নিশ্চয় কিয়ামতের দিনই কেবল তোমাদিগকে তোমাদের কর্মের পূর্ণ প্রতিদান দেওয়া হইবে। (আলে ইমরান: ১৮৬)

দোয়াপ্রার্থী: Humayun Kabir Molla, Nalhati, Birbhum

যুগ খলীফার সঙ্গে সমগ্র বিশ্বের আহমদীদের সম্পর্ক

"খলিফা-ই-ওয়াক্তের সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীতে বিস্তৃত প্রত্যেক আহমদির একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক রয়েছে। তাঁদের কাছ থেকে ব্যক্তিগত পত্র আসে, যেখানে তাঁদের ব্যক্তিগত বিষয়াবলি উল্লেখ থাকে। প্রতিদিন যে পরিমাণ চিঠি আসে, কেবল সেগুলোই যদি দেখা হয়, তবে তা দুনিয়ার মানুষের কাছে একেবারেই অকল্পনীয় বলে মনে হবে। এই খিলাফতের ব্যবস্থাই বিশ্বের যে প্রান্তেই বসবাস করুক না কেন, প্রত্যেক আহমদির কষ্টের প্রতি মনোযোগ দেয়। খলিফা-ই-ওয়াক্ত তাঁদের জন্য দোয়া করেন।

আহমদিয়া জামাতের সদস্যরাই সেই সৌভাগ্যবান মানুষ, যাঁদের শিক্ষার বিষয়ে খলিফা-ই-ওয়াক্ত চিন্তিত থাকেন। তাঁদের স্বাস্থ্যের বিষয়েও তাঁর উদ্বেগ থাকে। বিবাহ ও পারিবারিক সম্পর্কসংক্রান্ত সমস্যাও থাকে। সংক্ষেপে বললে, বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা আহমদিদের এমন কোনো সমস্যা-তা ব্যক্তিগত হোক বা জামাতি-নেই, যার প্রতি খলিফা-ই-ওয়াক্তের দৃষ্টি পড়ে না এবং যার সমাধানের জন্য তিনি বাস্তব প্রচেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলার দরবারে নত হয়ে দোয়া না করেন। আমিও তাই করি, এবং আমার পূর্ববর্তী খলিফাগণও এভাবেই করে এসেছেন।

দুনিয়ার এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে আমি রাতে ঘুমানোর আগে কল্পনায় পৌঁছাই না এবং যাদের জন্য ঘুমানোর সময়ও ও জাগ্রত অবস্থায়ও দোয়া না করি।"

(জুমআর খুতবা, ৬ জুন ২০১৪; প্রকাশিত: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ২৭ জুন ২০১৪, পৃ. ৭)

এমন একটি যুগে– যখন ইউরোপের লোকদের ইসলাম গ্রহণের কোনো ধারণাই করা যেত না– সেই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইংরেজীতে নিজ প্রবন্ধ অনুবাদ করিয়ে ইউরোপে বিতরণ করিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁকে এক জামা'ত দান করেন, তখন তিনি (আ.) তাদেরকে উপদেশ প্রদান করে বলেন, জিহাদ হলো ইসলামের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা এক মুহূর্তের জন্যও পরিত্যাগ করা যায় না। যেভাবে নামায, রোযা, হজ্জ এবং যাকাত ইসলামের এমন গুরুত্বপূর্ণ অংশ যেগুলোর ওপর আমল করা প্রত্যেক যুগে আবশ্যক, তেমনিভাবে জিহাদও এমন এক গুরুত্বপূর্ণ আমল যার ওপর সর্বযুগে আমল করা আবশ্যক। অতএব এ যুগে জিহাদ করার পদ্ধতি কী? আমাদের ওপর অভিযোগ আরোপ করা হয় যে, আমরা নাকি জিহাদ করি না। আমরা অবশ্যই জিহাদ করি, কিন্তু (জিহাদের) পদ্ধতি বদলে গেছে। এ বিষয়টি নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হয়। অআহমদী মুসলমানরা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আরোপ করে বলে, আমরা নাকি জিহাদ করি না! আমরা নাকি জিহাদের অস্বীকারকারী! অথচ আমরা যা করছি তা জিহাদই বটে, অর্থাৎ তবলীগের মাধ্যমে লোকদের মাঝে বাণী পৌঁছে দিচ্ছি, পৃথিবীময় ইসলাম ও আহমদীয়াতের প্রচার করছি আর আহমদীয়াতের মাধ্যমে লোকদেরকে ইসলামের সঠিক শিক্ষা সম্বন্ধে অবগত করছি। আফ্রিকা, ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, (উত্তর) আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দ্বীপপুঞ্জ– সর্বত্র আমাদের মিশন বিদ্যমান। এতসব কর্মযজ্ঞ কেন করা হচ্ছে? এ হলো সেই জিহাদ যাতে আমরা রত রয়েছি। তাই এ কথা বলা নিতান্ত ভুল যে, আমরা জিহাদে বিশ্বাসী নই। তবে হ্যাঁ, আমি পূর্বেও বলেছি, জিহাদের পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে গেছে।হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমাদের এ যুগের জিহাদ হলো কলমের মাধ্যমে জিহাদ। তোমাদের কলমের ফলা বা নিব– সেটি মূলত তরবারিরই ফলা। তাই এর মাধ্যমে তোমরা জিহাদ করো। এটি ধর্মের প্রচার করার যুগ। তাই এভাবে কলমের মাধ্যমে জিহাদ করো।অতএব এ বিষয়টি সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত এবং জগতকে বলা উচিত, তোমরা আমাদের সাথে কী বিতর্ক করছ? (তোমরা বলতে চাচ্ছ–) ইনি মসীহ্ মওউদ নন; মসীহ্ তো জীবিতাবস্থায় (আকাশে) রয়েছেন; মসীহ্ মওউদ তো এভাবে আসার কথা না। এগুলো সবই ভুল। তাদেরকে সঠিকভাবে বোঝাতে হবে যে, কুরআন ও হাদীস (এ বিষয়ে) কী বলে? একদিকে তারা বিশ্বাস করে যে, মসীহ্ এবং মাহদী আসবেন, অন্যদিকে তাঁকে অস্বীকারও করে। আমরা যদি তাদের সাথে আভিধানিক অর্থ ইত্যাদি নিয়ে বিবাদে জড়িয়ে পড়ি তবে এতে কোনো লাভ হবে না। তাদেরকে বলা উচিত– আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো, ইসলামকে পৃথিবীময় বিজয়ী করা, কেননা মহানবী (সা.) সমস্ত পৃথিবীর জন্য নবী ও রসূল হিসেবে আগমন করেছিলেন। আজ আমরা পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশের চেয়েও কম। আমরা যতদিন জগতকে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম না হবো, ততদিন আমরা কীভাবে একথা বলতে পারি যে, আমরা তো অনেক কাজ করে ফেলেছি!

আজ এভাবে জিহাদ করার দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে অর্পিত। এটি করলেই আমাদের জিহাদ সফল হবে। অন্যথায় অপরাপর মুসলমানরা যে জিহাদ করতে চায়– সেটি কি কোনো ফলপ্রসূ জিহাদ? ঐ জিহাদে কি কোনো উত্তম ফলাফল লাভ হচ্ছে? কোনো লাভ হচ্ছে না।

অতএব প্রত্যেক আহমদীকে এই জিহাদই করতে হবে– যে জিহাদ করতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন। তরবারির মাধ্যমে (জিহাদ) নয়, যার ফলে মুসলমানদের কোনো লাভ হচ্ছে না। এর ফলে তো মুসলমানরা সব জায়গায় অপমানিত হচ্ছে। তবে হ্যাঁ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে, আর এতক্ষণ আমি যেসব কথা বলেছি, সেগুলোর মাধ্যমে করতে হবে। প্রজ্ঞার সাথে তবলীগের পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করুন, আল্লাহ্ তা'লার সাথে দৃঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি করুন।

জামা'তের মুরব্বীদেরও উচিত, জামা'তের সদস্যদের তরবিয়ত করার মাধ্যমে এমন সেনাদল প্রস্তুত করা যারা এই জিহাদে অংশগ্রহণ করবেন। মুরব্বীদের উদ্দেশ্য বলতে চাই, তাদের ওপর অনেক বড়ো দায়িত্ব অর্পিত। তারা কেবল জামা'তের সদস্যদের তরবিয়ত করলেই চলবে না, বরং তরবিয়তের পাশাপাশি জামা'তের সদস্যদের আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাতে হবে। এই কাজগুলো করার পাশাপাশি তাদেরকে জ্ঞানে সমৃদ্ধ করতে হবে এবং তাদেরকে এই জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে হবে। এ কাজগুলো করতে পারলেই তারা নিজেদের অঙ্গীকার পূর্ণকারী হতে সক্ষম হবে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুরব্বীদের উপদেশ দিতে গিয়ে একবার বলেছিলেন যে, কীভাবে তবলীগ করা উচিত এবং একজন মুরব্বীর কেমন হওয়া উচিত।

বরং দুই-তিনটি উপলক্ষ্যে তিনি মুরব্বীদের এই উপদেশগুলো দিয়েছিলেন, তবে সেগুলো বেশ দীর্ঘ। কখনও যদি সুযোগ হয় তাহলে বর্ণনা করব। এখন আমি সেগুলোর সারসংক্ষেপ বর্ণনা করছি, অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লেখ করছি।

প্রথম কথা হলো, একজন মুরব্বীর মধ্যে 'তাযকিয়ায়ে নাফস' (তথা আত্মশুদ্ধি) থাকা উচিত। সে নিজে আত্মশুদ্ধি করার চেষ্টা করবে এবং এরপর জামা'তের সদস্যদের আত্মশুদ্ধি করানোর চেষ্টা করবে। তার তাহাজ্জুদের অভ্যাস থাকা উচিত, এবং সেইসাথে জামা'তের সদস্যদেরও ইবাদতের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবে। সে নিজে গভীর অভিনিবেশ সহকারে পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করবে এবং জামা'তের সদস্যদেরকেও অধ্যয়নের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করবে। যদি দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ তৈরি করতে হয় তবে পদ্ধতিটি এমন হওয়া উচিত– মানুষ যেন 'যিকরে ইলাহী'র দিকে নিজেও মনোযোগ দেয় এবং জামা'তের সদস্যদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করে। এদিকেও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন যে, ব্যক্তিগত লাইব্রেরিও একটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। কেননা এর মাধ্যমে পড়ার আগ্রহ তৈরি হয়। যেভাবে এ যুগে বইপুস্তকের প্রচলন অনেকটা কমে গেছে, কিন্তু আল-ইসলাম ওয়েবসাইটে অনেক বই এবং জামা'তের অনেক সাহিত্য বিদ্যমান। যাদের বই কেনার সামর্থ্য নেই বা যাদের মধ্যে এমন আগ্রহ তৈরি হয় না, তারা যেন অন্তত এদিকে মনোযোগ দেয় এবং অধ্যয়নের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে নেয়। সেইসাথে তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাও অনেক বেশি থাকা উচিত।

কারো অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ্ তা'লাকেই প্রতিটি বিষয়ের উৎস মনে করা উচিত, কারণ আল্লাহ্ তা'লার মাধ্যমেই আমরা সবকিছু পেয়ে থাকি। মানুষের সাথে সম্পর্ক উন্নত করা উচিত। আমাদের জনসংযোগও খুবই দুর্বল, যার কারণে তবলীগের গণ্ডি সীমিত হয়ে যায়। আমাদের এই দিকেও মনোযোগ দেওয়া উচিত। খুব কম লোকই আছে যারা সম্পর্ক বাড়ানোর দিকে মনোযোগ দেয়। আমরা যখন এ বিষয়ে অগ্রসর হবো এবং আমাদের সদস্যদের এগিয়ে নিয়ে যাব, তখন আমাদের তবলীগের ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হতে থাকবে।

আবার বীরত্বের সাথে মন্দকে প্রত্যাখ্যান করার সৎসাহসও থাকা উচিত। এটিও খুব বড়ো একটি গুণ যা একজন মুরব্বীর মধ্যে থাকা উচিত এবং এটি জামা'তের মধ্যেও সৃষ্টি করতে হবে।

অবিচলতার অভ্যাস থাকা উচিত। আমল এমন হওয়া উচিত নয় যে, চার দিন ভালো কাজ করে নিল, তবলীগের উদ্দীপনা দেখালো বা ইবাদত করে নিল আর তারপর ভুলে গেল; এমনটি হলে চলবে না। বরং একদিকে সে নিজে যেমন এ ই বিষয়গুলোতে অবিচল থাকবে, তেমনিভাবে জামা'তের মাঝেও এই স্পৃহা তৈরি করবে। যখন মুরব্বীরা নিজেরা এসব বিষয়ে আমল করবে, তখন জামা'তের মধ্যেও নিশ্চিতভাবে এই স্পৃহা তৈরি হবে। তখন এমন দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্ তৈরি হবে যারা মানুষের প্রশ্নের সঠিকভাবে উত্তর দিতে সক্ষম হবে এবং তাদেরকে বিব্রত হতে হবে না।

(সূত্র; মুবাল্লিগীনদের প্রতি হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর উপদেশবার্তা, পৃ: ১,১৩,২০)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, কেবল ভাষা শিখলেই তবলীগের পদ্ধতি শেখা হয়ে যায় না, বরং মূল বিষয় হলো জ্ঞান। এছাড়া গভীরভাবে চিন্তা করার অভ্যাস থাকা উচিত, আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক থাকা উচিত।

এই সমস্ত বিষয় একদিকে যেমন একজন মুরব্বীর মধ্যেও থাকা উচিত, অন্যদিকে জামা'তকে এগুলো শেখানোর চেষ্টা থাকা উচিত। যদি এমনটি হয়, তবে এর মাধ্যমে আমরা এক মহাবিপ্লব সৃষ্টি করতে পারি। তখনই আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর পতাকাকে পৃথিবীতে উড্ডীন করার যোগ্য হতে পারব আর তখনই আমরা মুসলমানদেরকেও প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদীর সত্যতা সম্পর্কে অবগত করতে পারব এবং তাদেরকে তাঁর হাতে বয়আত গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাতে পারব। সুতরাং অনেক দায়িত্ব রয়েছে যেগুলো পালনের দিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং সেগুলো পালন করা প্রয়োজন, আর এক্ষেত্রে আমাদের মুরব্বীদের অনেক বড়ো ভূমিকা পালন করা দরকার। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এর সৌভাগ্য দিন এবং দাঈয়ানে ইলাল্লাহ্‌দেরকেও সৌভাগ্য দিন, তারা যেন সঠিক জ্ঞান লাভ করে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক তৈরি করে এবং এরপর ইসলাম ও আহমদীয়াতের বার্তাকে বিশ্বের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে দিতে পারে। (আমীন)

(আল ফজল ইন্টারন্যাশনাল, ২রা জানুয়ারী, ২০২৬)

❁****❁****❁****❁

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা একথা ভুলে যেও না যে, খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহ ব্যতিরেকে তোমরা আদৌ জীবিত থাকতে পার না।

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৬২৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

ইসলামী ঐক্য

মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণকারী, মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের রীতিনীতিগুলোর প্রতি সামান্যতম ভালোবাসা রাখে তবে সে অবশ্যই এটি লক্ষ্য করে যে, তার পিতৃপুরুষ কারা ছিলেন, ইসলাম কোথা থেকে এসেছে, ইসলাম কোন ভিত্তি থেকে উঠেছে আর কীভাবে পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছে? আমার প্রশ্ন হল, সকল ক্ষেত্রে কি ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব? সকল মতবিরোধ দূর করা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পরেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব যে, আমরা দাবি করছি, আমরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে পারব। আর আমরা যদি ঐক্য সৃষ্টি করতে পারি তবে কোন নীতির ভিত্তিতে আমরা সৃষ্টি করতে পারব আর কোন নীতির ভিত্তিতে (ঐক্য) করতে পারব না।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর ২৫ মার্চ ১৯৫২ সালে হায়দারাবাদ, সিন্ধু প্রদেশে প্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণ

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন,আমার আজকের বক্তৃতার বিষয়বস্তু হল 'মুসলিম ঐক্য'। এই (বিষয়বস্তুর) কয়েকটি মর্মার্থ হতে পারে। এর একটি মর্ম এটিও হতে পারে, মুসলমানদের ঐক্য কোন্ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত আছে এবং এটির এ-ও অর্থ হতে পারে যে, মুসলমানদের ঐক্য কোন কোন ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করা উচিত। অর্থাৎ এক প্রেক্ষাপটে উক্ত বিষয়বস্তুর এই তাৎপর্য গ্রহণ করা হবে, বক্তা এটি স্বীকার করেন, মুসলমানদের মাঝে ঐক্য পাওয়া যায়, কিন্তু তিনি শুধু এই ঐক্যের অবস্থা বর্ণনা করতে ইচ্ছুক। দ্বিতীয় অর্থের প্রেক্ষিতে উল্লেখিত বিষয়বস্তুর এই তাৎপর্য হবে, মুসলমানদের মাঝে ঐক্যের অভাব রয়েছে আর আমাদের তা প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কিন্তু তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য কোন কোন মাধ্যম অবলম্বন করা উচিত। আমি মনে করি, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যিনি ইসলামী বিশ্ব নিয়ে অধ্যয়ন করেছেন অথবা প্রত্যেক গোষ্ঠি, যারা মুসলমানদের অবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করেছেন, দেখেছেন এবং পর্যালোচনা করেছেন তারা নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্তে উপনিত হবেন, মুসলমানদের মাঝে কোন না কোনভাবে ঐক্যের আবশ্যকতা রয়েছে। কেননা বর্তমান যুগে মুসলমানরা ঐক্যের সেই ভিত্তিগুলো থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে যা দৃঢ় ও মজবুত অট্টালিকার জন্য আবশ্যক। আর যাইহোক, মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণকারী, মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী কোন ব্যক্তি যদি ইসলামের রীতিনীতিগুলোর প্রতি সামান্যতম ভালোবাসা রাখে তবে সে অবশ্যই এটি লক্ষ্য করে যে, তার পিতৃপুরুষ কারা ছিলেন, ইসলাম কোথা থেকে এসেছে, ইসলাম কোন ভিত্তি থেকে উঠেছে আর কীভাবে পৃথিবীতে প্রসার লাভ করেছে? এটি স্পষ্ট বিষয় যে, মহানবী (সা.) না সিন্ধুতে জন্মগ্রহণ করেছেন আর না সিন্ধুতে এসেছেন। মহানবী (সা.) না ভারতবর্ষে জন্মেছেন আর না ভারতবর্ষে এসেছেন। অনুরূপভাবে মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরাও না সিন্ধুতে জন্মেছেন আর না এখানে এসেছেন। এতে কোন সন্দেহ নাই, কতিপয় সাহাবী সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা এখানে এসেছিলেন এবং এখানেই ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু এটি ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত নয়। যাহোক, এক বা দু'জন সাহাবীর এখানে আসা যদি প্রমাণিতও হয় তাহলে এটি একটি ব্যতিক্রমী বিষয়। আবার এটিও প্রমাণিত নয় যে, মহানবী (সা.)-এর যুগে সিন্ধুর মানুষ মক্কা বা মদীনাতে গিয়েছিল, তাঁর (সা.) বৈঠকে বসেছিল আর তারা মহানবী (সা.)-এর কথাবার্তা দ্বারা উপকৃত হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখেছি ইসলাম এখানে এসেছে এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ তা গ্রহণ করেছে। এই বিষয়টি প্রমাণ বহন করে, ইসলামের ওপর কোন এক সময় উজ্জ্বল যুগ এসেছে, এর ওপর বিজয়ের যুগও এসেছে, এটি সম্মানের সাথে এখানে এসেছে। এরপর সিন্ধু থেকে বেরিয়ে ইউপি, সিপি, বিহার এবং বাংলা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এরপর চীন পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এরপর উত্তরের সীমান্ত থেকে বুখারা, চীনী, তুর্কিস্তান এবং ককেশিয়া থেকে বের হয়ে পোল্যাণ্ড পর্যন্ত পৌঁছে যায়। পোল্যাণ্ডে এখনও পর্যন্ত মুসলমানদের প্রত্নতাত্তিক নিদর্শন পাওয়া যায়। মোটকথা ইসলাম- যা দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে বিস্তৃতি লাভ করেছে- এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে সকল ব্যক্তি অবগত। কিন্তু আজ এই শ্রেষ্ঠত্বের চিহ্ন কোথায় পাওয়া যায়? আল্লাহ! আল্লাহ! করে এতটুকু লাভ হয়েছে যে, কতক ইসলামী এলাকা স্বাধীনতার শ্বাস গ্রহণ করছে। তবে এই স্বাধীনতা রাজনৈতিকভাবে লাভ হয়েছে, নতুবা মাহাত্ম্য বা শ্রেষ্ঠত্বের ক্ষেত্রে ইসলামী এলাকাসমূহ এখনও বহু দূরে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মহত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব আর পরাক্রমশালীর অর্থ হল, যদি কোন দেশ কোন এলাকায় আক্রমণ করে তবে সেই এলাকার বাসিন্দারা এই দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রত্যয় রাখবে যে, বাহ্যিক উপকরণাদি হোক বা চারিত্রিক উৎকর্ষতার দিক থেকেই হোক, তারা শত্রুকে দাঁতভাঙ্গা জবাব দিতে সক্ষম। শত্রুকে কেবল নিজেদের সীমান্ত থেকে বেরই করে দিবে না বরং স্বয়ং তাদের সীমান্তে গিয়ে তাদেরকে উচিৎ শিক্ষা দিবে। আর এ কথা সকলেরই জানা যে, এখন পর্যন্ত এমন কোন ইসলামী দেশ নাই যারা শত্রুর সীমান্তে গিয়ে তাদেরকে উচিৎ শিক্ষা দেওয়া তো দূরের কথা অপর কোন দেশের সাহায্য ছাড়া নিজেদের সুরক্ষা করতে পারে। প্রত্যেক ইসলামী দেশ নিজেদের সুরক্ষার জন্য আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড বা অপর কোন ইউরোপীয়ান শক্তির সাহায্য চাইতে বাধ্য হয়।

একটিও এমন ইসলামী দেশ নাই যারা সমরাস্ত্র তৈরি করে। সমরাস্ত্রের অর্থ এটি নয় যে, তারা রাইফেল মেরামত করছে অথবা রাইফেল বানিয়েছে। বর্তমান যুগে রাইফেলের কোন মূল্যই নাই। সমরাস্ত্র মানে হল, বড়ো বড়ো কামান, এ্যান্টি এয়ারক্রাফট গান, ডেস্ট্রয়ার, ডুবোজাহাজ, যুদ্ধবিমান, ক্রুজ প্রভৃতি। এই সমরাস্ত্রগুলো কোন ইসলামী দেশে তৈরি করা হয় না। বরং যদি বিবাদ হয় তবে এই কথার ওপর বিবাদ হয় যে, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড আমাদেরকে সমরাস্ত্র দেয় না। এর আরেকটি অর্থ হল আমরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নই। হ্যাঁ, তোমরা যদি আমাদের সাহায্য করো তবে আমরা আমাদের সুরক্ষা করতে পারব। যাহোক, আজ পর্যন্ত যা কিছু লাভ হয়েছে এজন্য আমরা খোদা তা'লার যতটা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি না কেন তা অপ্রতুল হবে। খোদা তা'লা কুরআন মজীদে বলেন- যদি তোমরা আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো তবে আমি তোমাদের প্রতি আরও বেশি অনুগ্রহ করব। তাই আমাদের অবশ্য কর্তব্য হল, আমরা যা কিছু লাভ করেছি এজন্য খোদা তা'লার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। এছাড়াও আমাদের কর্তব্য হল, আমরা যেন অনুভব করি, আমরা এখনো সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জন করতে পারি নাই যা অর্জন করা ব্যতীত আমরা না বীরত্ব ও সাহসীকতার সাথে বসবাস করতে পারব এবং না কোন দেশকে চ্যালেঞ্জ করতে পারব।

উদাহরণস্বরূপ, বর্তমান যুগে রাশিয়ার শক্তি আছে, আমেরিকার শক্তি আছে, ইংল্যাণ্ডের শক্তি আছে। এরপর আরও ফ্রান্স, ইতালি এবং জার্মানের শক্তি আছে। উপনিবেশগুলোর মাঝে অস্ট্রেলিয়া এবং কানাডার শক্তি আছে। জাপানও মাথা উঁচু করছে। কিন্তু অর্থ-সম্পদ, যুদ্ধোপকরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিল্প-কারখানা প্রভৃতির দিক দিয়ে কোন ইসলামী দেশ বা ইসলামী দেশসমূহের সংগঠন এমন আছে কি যাকে আমরা এই শক্তিসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উপস্থাপন করতে পারব? এমন কোন ইসলামী দেশ আছে কি যে এ কথা বলতে পারবে, এই দেশগুলোর কাছে যদি এতগুলো কামান থাকে তবে আমার কাছেও এতগুলো কামান আছে, তাদের কাছে যদি গোলাবারুদ থেকে থাকে তবে আমার কাছেও গোলাবারুদ আছে, তাদের কাছে যদি যুদ্ধোপকরণ থেকে থাকে তবে আমার কাছেও যুদ্ধোপকরণ আছে, তাদের কাছে যদি শিল্প-কারখানা থাকে তবে আমার কাছেও শিল্প-কারখানা আছে, তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যদি বিস্তৃত হয়ে থাকে তবে আমার ব্যবসা-বাণিজ্যও বিস্তৃত। মুসলমানদের শক্তিমত্তা সেই রাষ্ট্রসমূহের বিপরীতে ময়দায় লবনের উপস্থিতির মতোও না। অতএব মুসলিম ঐক্যের বিষয়ে বক্তৃতা করার জন্য এ ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা আবশ্যক যে, মুসলমানদের মাঝে ঐক্য কীভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে যাতে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠবে আর তাদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হবে।

'ইত্তেহাদ' (ঐক্য) আরবী শব্দ। এটি 'ওয়াহদাত' থেকে নির্গত, যার অর্থ ঐক্য বা একতা অবলম্বন করা। এই শব্দটি স্পষ্ট করছে, এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে, মতানৈক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সংকল্প করেছে, তারা নিজেদের স্বতন্ত্রতা খুঁইয়ে ঐক্য ও একতা অবলম্বন করবে। আরবী ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য হল, এটি মর্মার্থকে এমনভাবে বর্ণনা করে যে, একটি শব্দের মাঝে সকল প্রকার দর্শন পরিস্ফুটিত হয়। 'ইত্তেহাদ' শব্দটি উর্দূ ভাষায় প্রবেশ করে নিজের মূল অর্থ খুঁইয়ে বসেছে। কিন্তু আরবী ভাষায় এই শব্দ যখন ব্যবহার করা হয় তখন এর দর্শন সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে, বক্তা কয়েকটি বিষয় সমর্থন করে। সে স্বীকার করে, ইসলামে অনেক দল-উপদল আছে এবং তারা সকলেই স্বতন্ত্র। আবার এই দলগুলো কতক উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে ইচ্ছা ও সংকল্প নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায়।

অতএব এক ব্যক্তি যখন একথা বলবে যে, মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য হওয়া উচিত, তাহলে সে স্বীকার করে, মুসলমান রাষ্ট্রসমূহ এবং জনসাধারণের

মাঝে বিভিন্ন দল-উপদল রয়েছে। আর আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি, আমরা এই দল-উপদলগুলো এবং জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করব। যেন ইত্তেহাদ-এর অর্থ হল, সংস্কৃতির ভিত্তি রাখা। সভ্যতারও একই অর্থ। সভ্যতার অর্থ হল, একত্রে বসবাস করা এবং কতক বিধিনিষেধ নিজের ওপর আরোপ করে নেয়া। আমরা যদি বলি, মানুষ সভ্য স্বভাব বিশিষ্ট তাহলে এর অর্থ হল, কুকুর, শুকর এবং বিড়ালের মাঝে এই শক্তি বা ক্ষমতা নাই যে, এগুলো নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থকে পরিত্যাগ করে জাতীয়স্বার্থকে প্রাধান্য দিবে, কিন্তু মানুষের মাঝে এই বৈশিষ্ট্য বা গুণ পাওয়া যায় যে, তারা অনেক সময় জাতীয় স্বার্থের খাতিরে ব্যক্তিস্বার্থকে উপেক্ষা করে থাকে। আর এই বিষয়টিই 'ইত্তেহাদ' তথা ঐক্য হয়ে থাকে। সকল বিষয়ে 'ইত্তেহাদ' বা ঐক্য অসম্ভব। ঐক্য শুধুমাত্র কিছু বিষয়ে হতে পারে আর কিছু বিষয়ে হবে না। না প্রত্যেক বিষয়ে ঐক্য হতে পারে আর না প্রত্যেক বিষয়ে ঐক্য হওয়া ফলপ্রসূ হবে। অতএব এই প্রেক্ষিতে আমার প্রশ্ন হল, সকল ক্ষেত্রে কি ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব? সকল মতবিরোধ দূর করা কি সম্ভব? এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানের পরেই আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারব যে, আমরা দাবি করছি, আমরা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হতে পারব। আর আমরা যদি ঐক্য সৃষ্টি করতে পারি তবে কোন নীতির ভিত্তিতে আমরা সৃষ্টি করতে পারব আর কোন নীতির ভিত্তিতে (ঐক্য) করতে পারব না।

সর্বপ্রথমে আমাদের সেই পার্থক্যগুলো লক্ষ্য করা উচিত যার কারণে মানুষ বিভক্ত হয়। আর আমরা যদি পরিপূর্ণভাবে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে চাই তাহলে আমাদেরকে এই বিষয়টিও দেখতে হবে যে, কোন কোন শক্তিকে আমাদের পরাভূত করতে হবে এবং সেই শক্তিসমূহকে দূর করার ফলে আমাদের কোন শক্তি অর্জিত হবে। কোন জাতির প্রাকৃতিক মৌলিক বৈসাদৃশ্যগুলো হল, প্রথমত: নারী-পুরুষের বৈসাদৃশ্য। এই বৈসাদৃশ্য সব জায়গাতেই আছে। নারী-পুরুষের কাজ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্যও আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। সন্তান জন্মদান নারীর স্কন্ধে অর্পিত হয়েছে আর পুরুষের স্কন্ধে জীবনের প্রয়োজন নিবারণ। সন্তান লালনপালনের দায়িত্ব নারীর ওপর ন্যস্ত এবং পুরুষের ওপর বাহির সামলানোর দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে। মোটকথা নারী-পুরুষের শক্তি ও সামর্থ্য আলাদা। এগুলোর মাঝে ঐক্য হওয়া সম্ভব নয়। আর এই বিষয়টি যদি সম্ভবও হতো যে, এই বৈসাদৃশ্য দূর করা যেত তাহলে মানুষ তা কখনও পছন্দ করত না। এই বৈসাদৃশ্য দূর করা আত্মহননের নামান্তর হবে। নারী-পুরুষের মাঝে যে বৈসাদৃশ্য রয়েছে তা নিঃসন্দেহে বলবৎ থাকবে। খোদা তা'লা কুরআন মজীদে বলেছেন, আমরা তোমাদের ওপর এই অনুগ্রহ করেছি যে, আমরা নরনারী সৃষ্টি করেছি। এই উভয়ের মাধ্যমে আমরা মানবধারা সূচিত করেছি যেন মানুষ পুণ্য ও খোদাভীতি অবলম্বন করে আর এরপর আমরা তাদের মাঝে স্বীয় গুণাবলি সৃষ্টি করেছি।এরপর দৈহিক আকৃতি ও গঠনের পার্থক্য রয়েছে। কতক দেশের মানুষ দীর্ঘাকৃতির হয়ে থাকে আর কতক দেশে ক্ষর্বাকৃতির মানুষ পাওয়া যায়। এরপর শারীরিক স্বাস্থ্যের পার্থক্য রয়েছে। কেউ শীর্ণকায় হয়ে থাকে আবার কেউ স্থূলকায় হয়ে থাকে। এরপর গায়ের রং ও উজ্জ্বলতার পার্থক্য রয়েছে। কেউ বাদামী রঙের, কেউ বা গৌর বর্ণের। কেউ বা পীত বর্ণের আর কেউ লালচে বর্ণের। আফ্রিকানদের মাঝে যাও- সেখানে কৃষ্ণ বর্ণের মানুষ দেখতে পাবে। ভারতবর্ষের অধিবাসীরা গোধুম বর্ণের হয়ে থাকে। চীনারা পীত বর্ণের হয় আর আরবে উট পাখির ডিমের রঙের অনুরূপ বর্ণের লোক পাওয়া যায়। ইউরোপে গৌর বর্ণের মানুষ পাওয়া যায়।

এরপর মুখায়বেরও ভিন্নতা রয়েছে। কারও চিবুক ঝুলে থাকে, কারও উঁচু থাকে। কারও দাড়ি কম হয় আর কারও দাড়ি বেশি। আবার কেউ সুঠাম দেহের অধিকারী হয় আর কেউ ছিপছিপে গড়নবিশিষ্ট। এরপর বল বা শক্তিমত্তার মাঝেও পার্থক্য রয়েছে। কেউ বেশি শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে আর কেউ কম শক্তির। আবার সুন্দর ও অসুন্দরের মাঝেও পার্থক্য আছে। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাঝেও পার্থক্য আছে। কারও মাঝে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বেশি থাকে এবং কারও মাঝে কম। কারও স্মরণশক্তি প্রখর হয় আর কারও কম। আবার পঞ্চইন্দ্রিয়ের পার্থক্য রয়েছে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমরা দেখি, ডাক্তার চশমার পরামর্শ দিলে কাউকে ১ শক্তির চশমা নির্দেশ করেন আবার কাউকে ২ শক্তির চশমা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। কাউকে দূরদৃষ্টির চশমা প্রদান করেন আবার কাউকে নিকটদৃষ্টির চশমা প্রদান করেন। এরপর স্বাদের মাঝেও পার্থক্য আছে। কতিপয় মানুষ সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম স্বাদও আস্বাদন করতে পারে। ইংরেজদের মাঝে এই গুণটি আধিক্যের সাথে পাওয়া যায়। সেখানে স্বাদের অনুশীলন করা হয়। মদের প্রচলন সেখানে স্বাভাবিক বিষয়। তারা এমন লোককে- যে এটি বলতে পারে যে, এই মদ কোন বছরের আঙ্গুর দিয়ে তৈরি তাকে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করে। ইসলামে যেহেতু মধ্যপন্থা অবলম্বনের আদেশ দেওয়া হয়েছে তাই মুসলমানদের মাঝে এতটা বাড়াবাড়ি নাই যে, তারা খাদ্যপানীয়র বস্তুর জন্য পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিবে। কিন্তু ইউরোপে খাদ্যপানীয়র বস্তুর জন্য হাজার হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুরূপভাবে ঘ্রাণশক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকার ঘ্রাণের ভিন্নতা নির্ণয় করার ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে। তারপর কণ্ঠস্বরের মাঝেও পার্থক্য বিদ্যমান। কারও গলা দিয়ে স্বর বের হয়, কারও নাক দিয়ে। কেউ কেউ এতো হেঁড়ে গলায় কথা বলে যে, নমনীয়তার লেশ মাত্র নাই। কেউ আবার এতো চিকন কণ্ঠে কথা বলে যে, তার মাঝে ছন্দ ও হৃদয়োত্তাপ পাওয়া যায়। তারপর বোঝা বহনের এবং আন্দাজ বা অনুমান করার ক্ষমতার মাঝেও ভিন্নতা আছে। কেউ এক মন বোঝা বহন করতে পারে, কেউ দুই মন বোঝা বহন করতে পারে। এরপর ওজন ও দূরত্বের আন্দাজ বা অনুমান করার মাঝেও ভিন্নতা আছে। একজন সৈনিক খালি চোখে দেখেই বলতে পারে যে, এই দূরত্বের ব্যবধান এক ফিট নাকি দুই ফিট। পরিমাপ যন্ত্র তো সম্প্রতি আবিষ্কার হয়েছে। পূর্বে অফিসারদেরকে দূরত্ব অনুমান করার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। শুধুমাত্র খালি চোখে দেখেই অনুমান করে সৈনিকরা কাজ করত। অফিসাররা চোখে দেখেই অনুমান করে বলতে পারত, এখন কত দূরত্বে গোলা ছোড়া আবশ্যক এবং কামান কত দূরত্বে গোলা নিক্ষেপ করছিল। পূর্বের যুগে শুধুমাত্র চোখের চাহুনির মাধ্যমে দূরত্বের অনুমান করার অভিজ্ঞতার গুণে বড়ো বড়ো যুদ্ধে বিজয় অর্জিত হয়েছিল। কিন্তু কতিপয় মানুষের এই বিষয়ে কোন ধারণাই থাকে না যে, চোখের মাধ্যমে কীভাবে অনুমান করা যায়। অযথাই ভারসাম্যহীন কথা বলে দেয়।

একটি কৌতুক প্রচলিত আছে যে, এক রাজার দ্বারা কোন পাপ সংঘটিত হয়। পণ্ডিতরা বলে, এই পাপ মোচন হবে না। হ্যাঁ, অমুক ধরনের ব্রা ক্ষণকে এত পরিমাণ দান করুন তবে এর প্রভাব দূর হতে পারে। রাজা খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন, কেননা যে ধরনের ব্রা ক্ষণ সন্ধান করা হচ্ছিল সেই ধরনের ব্রা ক্ষণ এই এলাকায় ছিল না। বাদশাহ্ উজিরদেরকে আদেশ দেন, তারা যেন সেই ধরনের ব্রা ক্ষণের সন্ধান করেন। অতঃপর একজন উজির বলে, আপনি যদি অনুমতি দেন তবে আমি এই ধরনের ব্রা ক্ষণের সন্ধান করব। বাদশাহ তাকে অনুমতি প্রদান করেন। অতঃপর সে পথে দাঁড়িয়ে যায় যেন পথিকদের পরীক্ষা করে নির্ধারণ করতে পারে যে, তাদের মাঝে ব্রা ক্ষণ কে? প্রজারা যখন জানতে পারে বাদশাহ এক ব্রাহ্মণের খোঁজে আছেন কিন্তু তার সন্ধান লাভ হচ্ছে না তখন তারা মিথ্যা বলা আরম্ভ করে আর নিজেদেরকে ব্রা ক্ষণ হিসেবে পরিচয় দেওয়া শুরু করে। যে শুদ্র সেও নিজেকে ব্রাহ্মণ পরিচয় দেয়, যে ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য অথবা অন্য কোন জাতের সেও নিজেকে ব্রাহ্মণ বলে পরিচয় দেয়, যেন সে যেকোনোভাবে দান লাভ করতে পারে। সেই উজির পথের ওপর দাঁড়িয়ে পথিকদের পরীক্ষা করছিল ইতোমধ্যে দুইজন ব্যক্তি ঐ পথ অতিক্রম করছিল। উজির ভাবল, হতে পারে উভয়ের মাঝে একজন ব্রাহ্মণ হবে। অতএব সে তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করে, তোমাদের মধ্যে কি কেউ ব্রাহ্মণ? তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি যে বেনিয়া ছিল- সে বলে, আমি ব্রাহ্মণ। অপর ব্যক্তি- যে বাস্তবিকই ব্রাহ্মণ ছিল, বলে, আমি ব্রাহ্মণ। উজির আদেশ দেয়, তাদের উভয়কে আমার কাছে নিয়ে আসো। তাদের জবানবন্দী নেওয়া হবে। সে বেনিয়াকে জিজ্ঞাসা করে, গাছ কত উঁচু হয়? বেনিয়া বলে, গাছ ৪৪-৪৫ ফুট উঁচু হয়। তারপর সে ব্রা ক্ষণকে সম্বোধন করে বলে, তুমি বলো, গাছ কত উঁচু হয়? সে বলে, গাছ ৪-৫ ফুট উঁচু হয়। অতঃপর উজির বলে, এ হল ব্রাহ্মণ। যেহেতু এরা ত্রাণের খেয়ে অভ্যস্ত আর নিষ্কর্মা থাকে তাই এরা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাটায় না, শুধুমাত্র লোকমুখে শোনা কথায় বিশ্বাস করে। যাইহোক উজির সেই ব্যক্তির নির্বুদ্ধিতার কারণে তাকে চিনে ফেলে এবং বলে, এই ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ, তাকে দান দিয়ে দাও।

(আনোয়ারুল উলূম, দ্বাবিংশ খণ্ড, পৃ. ৬২৯-৬৫৯)

গায়ের আহ্‌মদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর সাবধানবাণী

".....যারা বিরোধী মৌলভীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় হিংসা-বিদ্বেষ আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত না হবে, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব।..... এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না- যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী হয়।..... অতএব জামা'তের সকল সদস্য মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হবার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যক।" (মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১)

যুগ খলীফার বাণী

"জাতি সত্তা অর্জনের জন্য ঐক্য ও আনুগত্য অত্যন্ত জরুরী।" (খুতবা জুমআ, প্রদত্ত- ৫ ডিসেম্বর, ২০১৪)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, Bankura (W.B)

সৈয়্যদ মঞ্জুর আহমদ সাহেব উরফে আলি আহমদ সাহেব (উড়িশা)

সৈয়্যদ শাহিদ আহমদ, সাবেক সেক্রেটারী ইসলাহ ও ইরশাদ কাদিয়ান

১৯৭৩ সালের জানুয়ারির শুরুর দিকের শীতল দিনগুলো ছিল। লেখক তাঁর এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ভুবনেশ্বর রেলওয়ে স্টেশনে কাদিয়ান জলসা সালানা থেকে প্রত্যাবর্তনকারী সম্মানিত সদস্যদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। ট্রেন এসে থামল। বিভিন্ন বন্ধু ট্রেন থেকে নামতে লাগলেন, তাঁদের আত্মীয়স্বজন ব্যস্ত হয়ে তাঁদের লাগেজ নামাতে সাহায্য করছিলেন। আমি কী দেখলাম? ছেষট্টি বছর বয়সী এক বৃদ্ধ একাই ট্রেন থেকে নামলেন, যেন একজন চটপটে ও সজাগ যুবক। তিনি নিজ হাতে নিজের লাগেজ তুলে নিয়ে একদিকে এগিয়ে গেলেন। আমরা যখন সেই সাহসী ও প্রাণবন্ত বৃদ্ধকে সহায়তা দেওয়ার জন্য দ্রুত এগিয়ে গেলাম, তখন তিনি হাসিমুখে আমাদের সেবা গ্রহণ করলেন, আমাদের জন্য দোয়া করলেন এবং তারপর নিজের গন্তব্যের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আপনারা জানেন কি, এই বৃদ্ধ ব্যক্তি কে ছিলেন? তিনি ছিলেন সেই মহান ব্যক্তি, যিনি জামাত আহমদিয়া নিউ ক্যাপিটাল ভুবনেশ্বরের প্রথম সদর (সভাপতি) হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন; যিনি এই জামাতকে লালন-পালন করেছেন; যাঁর পরে বহু নিবেদিত খাদেমে সিলসিলা গড়ে উঠেছে; যাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা, পরিশ্রম ও দোয়ার কবুলিয়তের মাধ্যমে সিলসিলার অসংখ্য ফিদায়ী ও আশিক জন্ম নিয়েছে। তিনি ছিলেন প্রয়াত সম্মানিত সৈয়দ মনজুর আহমদ সাহেব, যিনি "আলী আহমদ"নামেও পরিচিত ছিলেন-একজন সাধারণ সরকারি কর্মচারী, যাঁর দোয়া, শ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে জামাত আহমদিয়া ভুবনেশ্বর পরিপক্বতায় পৌঁছেছিল।

সম্মানিত সৈয়দ সাহেবের জন্ম ৩০ অক্টোবর ১৯০৬ সালে ওডিশা প্রদেশের কটক জেলার সোনগড়া শহরের মহল্লা রাসুলপুর নামক গ্রামে। তাঁর সম্মানিত পিতার নাম ছিল হযরত আল-হাজ্জ সৈয়দ হাজী আহমদ আলী (হাজী আহমদ নামে পরিচিত), যিনি প্রতিশ্রুত মসীহ আলাইহিস সালামের সাহাবি ছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা নিজ বাড়িতে গ্রহণ করেন, এরপর মহল্লা গোহালিপুরের স্থানীয় মাদরাসায় পড়াশোনা করেন এবং তাঁর মামা হযরত সৈয়দ নিয়াজ হুসাইন সাহেব (প্রতিশ্রুত মসীহের সাহাবি)-এর নিকট ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করেন। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষায় প্রয়াত সম্মানিত সৈয়দ গোলাম মুহাম্মদ সাহেব (১৮৮৬-১৯৭১) এবং প্রয়াত সম্মানিত সৈয়দ মুহাম্মদ মহসিন সাহেব (১৮৮৯-১৯৬৮), যিনি একজন আতর ব্যবসায়ী ছিলেন, গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৯৩০ সালে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শিক্ষা সমাপ্তি ও বিবাহের পর ২৭ জানুয়ারি ১৯৩৯ সালে তিনি সরকারি ট্রেজারিতে প্রথম চাকরিতে যোগ দেন। পরবর্তীতে ১৯৫২ সালে তিনি ওডিশা প্রদেশের কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েটের ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টে স্থানান্তরিত হন এবং অবসর গ্রহণ পর্যন্ত সেখানেই কর্মরত থাকেন। এই সময়েই তিনি স্থানীয় আহবাবদের একত্রিত করে "জামাত আহমদিয়া ভুবনেশ্বর-এর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং কয়েক বছর ব্যতীত আজীবন ভুবনেশ্বরের সদর জামাত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটে কর্মরত অবস্থায় তিনি মানবসেবা ও সিলসিলার সেবায় অসংখ্য কাজ সম্পাদন করেন। এর মধ্যে আহমদি, অ-আহমদি ও অ-মুসলিমদের চাকরি পেতে সহায়তা করা এবং বিভিন্ন কল্যাণমূলক কাজে সহযোগিতা করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁর স্বভাব ছিল দয়া ও সহমর্মিতায় পরিপূর্ণ। তাঁরই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জামাত আহমদিয়া ভুবনেশ্বর থেকে বহু নিবেদিত খাদেমে সিলসিলা গড়ে ওঠেন-যেমন প্রয়াত সম্মানিত সৈয়দ উবাইদুস সালাম সাহেব (প্রাক্তন সদর), প্রয়াত সম্মানিত সৈয়দ মুহাম্মদ সরওয়ার সাহেব (প্রাক্তন সদস্য সদর আঞ্জুমান আহমদিয়া কাদিয়ান), সম্মানিত আবদুল কাদির খান সাহেব (প্রাক্তন আমির জামাত আহমদিয়া ভুবনেশ্বর এবং ওডিয়া ভাষায় কুরআনের অনুবাদকদের একজন), প্রয়াত সম্মানিত সৈয়দ আবদুল কাইয়ুম সাহেব (প্রাক্তন সেক্রেটারি মাল), প্রয়াত সম্মানিত সৈয়দ বশীর আহমদ সাহেব, প্রয়াত সম্মানিত গোলাম আহমদ উবাইদ সাহেব (প্রাক্তন সেক্রেটারি উমূরে আম্মা), সম্মানিত ড. মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক সাহেব (প্রাক্তন সদর ও আমির এবং ওডিয়া ভাষায় কুরআনের অনুবাদকদের একজন), সম্মানিত সৈয়দ তানভীর আহমদ সাহেব (সদর মজলিস ওয়াকফে জদীদ কাদিয়ান), প্রয়াত সম্মানিত সৈয়দ নাসির আহমদ সাহেব (প্রাক্তন অডিটর কাদিয়ান) এবং সম্মানিত সৈয়দ দাউদ আহমদ সাহেব (দপ্তর হিসাবের কর্মী) প্রমুখ।

আজ ভুবনেশ্বরের আহমদিয়া মসজিদের সুদৃশ্য ভবন, যা "মসজিদ হামদ"নামে পরিচিত, তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও বিনয়ী দোয়ার কবুলিয়তের ফল। মসজিদের জমি অর্জনের জন্য তিনি বারবার সরকারি মন্ত্রী ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। পরবর্তীতে সম্মানিত প্রাদেশিক আমির ওডিশার সহযোগিতায় তিনি কর্মকর্তাদের ও মন্ত্রীদের সঙ্গে পত্রালাপ অব্যাহত রাখেন এবং টানা তেইশ বছর ধরে চেষ্টা চালিয়ে যান।

সম্মানিত সৈয়দ সাহেবের স্বহস্তে লিখিত ডায়েরি ও অন্যান্য নথি অনুযায়ী, আহমদিয়া মসজিদ ভুবনেশ্বরের জন্য জমির অনুমোদন ২০ জুলাই ১৯৭৭ সালে ওডিশার তৎকালীন গভর্নর সরদার হরচরণ সিং ব্রার সাহেবের অনুমতিক্রমে প্রদান করা হয়। ২২ জুলাই ১৯৭৭ সালে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয় এবং ৫ আগস্ট ১৯৭৭ সালে জমির দখল নেওয়া হয়। ২৯ অক্টোবর ১৯৭৯ সালে জুমার নামাজের পর দোয়ার মাধ্যমে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। হযরত খলিফাতুল মসীহ চতুর্থ (রহ.)-এর বিশেষ দৃষ্টি ও অনুগ্রহে "শতবর্ষী জুবিলি প্রকল্প-এর আওতায় মসজিদটি সম্পন্ন হয় এবং তিনিই "মসজিদ হামদ"নামটি প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে ১৮ নভেম্বর ১৯৮৩ সালে প্রয়াত সম্মানিত সাহেবজাদা মির্জা ওয়াসিম আহমদ সাহেব (নাজির আ'লা কাদিয়ান) আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। দুঃখের বিষয়, এই পবিত্র উপলক্ষে প্রয়াত সম্মানিত সৈয়দ মনজুর আহমদ সাহেব উপস্থিত ছিলেন না; তিনি ইতিমধ্যে তাঁর প্রকৃত প্রভুর সান্নিধ্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন। আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লাহু ওয়ারহামহু।

তাঁর স্বভাব ছিল সরলতা ও বিনয়পূর্ণ। তিনি নিজের কাজে মনোনিবেশ করতেন। খাটো গড়ন, ফর্সা গায়ের রং, বড় চোখ ও উঁচু নাক-সরলতার এই প্রতিমূর্তিকে সাধারণত নামাজের সময়েই দেখা যেত। তিনি অত্যন্ত মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে নামাজ আদায় করতেন। তাশাহহুদ, রুকু ও সিজদায় তিনি যেন সম্পূর্ণ নিস্তেজ হয়ে যেতেন, যেন দেহ ও প্রাণ এক আল্লাহর দরবারে সমর্পণ করে দিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, এটাই সেই নামাজের অবস্থা, যা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিশ্রুত মসীহ আলাইহিস সালাম প্রেরিত হয়েছিলেন। প্রয়াত সৈয়দ মনজুর আহমদ সাহেব একজন মুসি ছিলেন। তাঁর ওসিয়ত নম্বর ছিল ৭৭৯৮ এবং বেহেশতি মকবরা কাদিয়ানে রেফারেন্স নম্বর ১৩৭৫-এর অধীনে তাঁর স্মারক ফলক স্থাপিত রয়েছে।

তাঁর উত্তম আদর্শ ও সুশীল চরিত্রের কারণে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা তাঁর সঙ্গে এতটাই পরিচিত হয়ে উঠেছিলেন যে, সিলসিলার যেকোনো কাজের জন্য তিনি যখন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন, তখন তিনি সর্বদা সহযোগিতা পেতেন। স্বয়ং এই নগণ্য লেখক বহুবার প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েটে প্রত্যক্ষ করেছেন যে, তিনি নির্ভয়ে সর্বোচ্চ সরকারি কর্মকর্তাদের কক্ষেও প্রবেশ করে জামাতের কাজ সম্পন্ন করতেন। অনেক সময় এটাও দেখা গেছে যে, পথে কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলে, কর্মকর্তারা উভয় হাত জোড় করে তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন জানাতেন। তাঁর সভাপতিত্বকালেই প্রয়াত সম্মানিত গোলাম আহমদ উবাইদ সাহেবের বিশেষ সহায়তায় প্রাদেশিক সরকার প্রয়াত ও মরহুম সাহেবজাদা মির্জা ওয়াসিম আহমদ সাহেবকে "স্টেট গেস্ট"ঘোষণা করে, এবং এই সম্মান তাঁর জীবনের শেষ পর্যন্ত বহাল ছিল।

সম্মানিত সৈয়দ সাহেব জামাতের আহবাবদের কল্যাণ ও উন্নতির বিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীল ছিলেন। সদস্যদের প্রশিক্ষণের জন্য তিনি তাঁদের বারবার ইজলাসে আহ্বান করতেন এবং তাবলিগি প্রতিনিধি দলে অন্তর্ভুক্ত করতেন। তিনি অসংখ্য সরকারি কর্মকর্তা, মন্ত্রী, গভর্নর, অ-মুসলিম বিশিষ্ট ব্যক্তি ও আলেমদের সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করে আহমদিয়াতের বার্তা পৌঁছে দেন। যখনই তিনি নিজ জন্মভূমি সোনগড়ায় যেতেন, তখন তাঁর বিরোধী আত্মীয়দেরও তাবলিগ করতেন, যাতে তারাও আহমদিয়াতের নেয়ামত লাভ করতে পারে।

খুলাফায়ে আহমদিয়াত ও প্রতিশ্রুত মসীহ আলাইহিস সালামের পরিবারবর্গের প্রতি তাঁর গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি বারবার কাদিয়ানের কেন্দ্রীয় মারকাজে যেতেন এবং ১৯৬০ সালে হযরত মুসলে মওউদ (রা.)-এর সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভের উদ্দেশ্যে রাবওয়ায় যান। তাঁর একমাত্র পুত্রের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য তিনি তাকে তালিমুল ইসলাম কলেজ, রাবওয়ায় ভর্তি করান এবং প্রয়াত হযরত মির্জা নাসির আহমদ সাহেব (প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, তালিমুল ইসলাম কলেজ, রাবওয়া)-এর তত্ত্বাবধানে সোপর্দ করেন।

তাঁর সমগ্র জীবন ধর্মসেবা, মানবসেবা এবং সিলসিলা আলিয়া আহমদিয়ার জন্য উৎসর্গিত ছিল। তাঁর ৭৬ বছরের জীবনে তিনি নিজের সব কাজ নিজ

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামন-বাসনা শিরকের অন্তর্ভুক্ত। এটি এড়িয়ে চলা আবশ্যক।

(খুতবা জুমআ, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam Master, Nararvita (Assam)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সদকা কখনও কারো সম্পদ হ্রাস করে নি আর আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা দানের কারণে বান্দার সম্মান বৃদ্ধিই করে থাকেন।

(সহী মুসলিম, কিতাবুর বির ওয়াসসিলাহ ওয়াল আদাব)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2026 -2028 Vol-11 Thursday, 22 Jan 2026 Issue No.4

Act.
MANAGER
ATHAR AHMAD SHAMIM
Mob: +91 9815639670
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

হাতে করতেই পছন্দ করতেন এবং নিজেই উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য অসুস্থতা অনুভব করেন; হাসপাতালে পৌঁছামাত্রই তিনি প্রাণদাতা প্রভুর হাতে নিজের প্রাণ সোপর্দ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর ইন্তেকাল ১৬ অক্টোবর ১৯৮২ সালে হয় এবং পরবর্তীতে তাঁকে তাঁর পৈতৃক কবরস্থানে, মহল্লা রাসুলপুর, সুংড়ায় দাফন করা হয়।

ওড়িশা প্রদেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা "সমাজ"নিম্নলিখিত ভাষায় তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে–

সদর জামাত আহমদিয়া ভুবনেশ্বর–এর ইন্তেকাল

কটক, ২০ অক্টোবর: বিশ্বব্যাপী জামাত আহমদিয়ার শাখা ভুবনেশ্বরের সদর সৈয়দ মনজুর আহমদ সাহেব গতকাল ১৬ অক্টোবর ১৯৮২ সালের রাতে ভুবনেশ্বর জেনারেল হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি সামান্য অসুস্থতার কারণে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তাঁর পবিত্র মরদেহ "ইউনিট–৪–এর মসজিদে দর্শনার্থীদের জন্য রাখা হয়। পরবর্তীতে ১৭ অক্টোবর সন্ধ্যায় সালেপুরের নিকটবর্তী মহল্লা রাসুলপুরে তাঁকে দাফন করা হয়। তিনি ছিলেন একজন নেককার ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি। জাতীয় সেবার পাশাপাশি হিন্দু–মুসলিম ঐক্যের ক্ষেত্রেও তিনি বিভিন্ন সময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

পত্রিকাটির সম্পাদক–ইন–চিফ ড. রাধানাথ রথ সাহেব তাঁর শোকবার্তায় জামাতের সদস্যবৃন্দ ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং দোয়া করেন যেন আল্লাহ তাআলা মরহুমের রূহকে শান্তি দান করেন।

(দৈনিক সমাজ, ২১ অক্টোবর ১৯৮২, পৃষ্ঠা ২)

আল্লাহ তাআলা তাঁকে দুই কন্যা ও এক পুত্র দান করেছিলেন। জ্যেষ্ঠ কন্যা প্রয়াত সম্মানিত হাবিবা খাতুন সাহেবা (১৯৩১–১৯৭৯) পদনপাড়া (নিয়ালি) এলাকার এক মুস্তাজাবুদ–দাওয়াত বন্ধু প্রয়াত সম্মানিত মাওলভি চৌধুরী খলিলুদ্দিন আহমদ খান ফাজিল সাহেবের সঙ্গে বিবাহিত ছিলেন। দ্বিতীয় কন্যা প্রয়াত সাইয়েদা মনসুরা খাতুন সাহেবা (১৯৫১–১৯৯৬)–এর বিবাহ কেয়োঁঝরে সম্পন্ন হয়। পুত্র, আমাদের ভাই প্রয়াত সৈয়দ মনসুর আহমদ সাহেব ২০২১ সালে ইন্তেকাল করেন।

মরহুম তাঁর পেছনে মোট সাতজন নাতি–নাতনি ও দৌহিত্র রেখে গেছেন। দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা সম্মানিত সৈয়দ সাহেবের সঙ্গে ক্ষমা ও মাগফিরাতের আচরণ করুন, তাঁকে আলিয়্যিনে স্থান দিন এবং আমাদেরকেও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

সীরাতুল মাহদী

হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ

(৭) আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

আমার নিকট আমার সম্মানিতা মাতা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) এই ঘটনা শুনিয়েছিলেন–একবার তিনি কোনো সফর থেকে কাদিয়ানে ফিরে আসছিলেন। বাটালায় পৌঁছে তিনি কাদিয়ানের জন্য একটি ঘোড়ায় টানা গাড়ি (টংগা) ভাড়া নেন। সেই গাড়িতে একজন হিন্দু যাত্রীও উঠতে চেয়েছিল। আমরা যখন উঠছিলাম, তখন সেই হিন্দু তাড়াহুড়ো করে সূর্যের বিপরীত দিকের আসনে বসে পড়ে, ফলে আমাকে সূর্যের দিকে মুখ করে বসতে হয়। হযরত সাহেব বলেন, আমরা যখন শহর থেকে বের হলাম, হঠাৎ একটি মেঘখণ্ড উঠল এবং আমার ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ল, এবং তা আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকল।

এই বিনীত বর্ণনাকারী আমার মাতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, এরপর সেই হিন্দু কি কিছু বলেছিল? তিনি উত্তর দেন যে, তাঁর মনে পড়ে–হযরত সাহেব বলেছেন, পরে সেই হিন্দু বহুবার ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল এবং লজ্জিত হয়েছিল। তিনি আরও বলেন, সেদিনগুলো ছিল তীব্র গরমের দিন।

এই বিনীত বর্ণনাকারী আরও নিবেদন করেন যে, মাওলভী শের আলী সাহেবও আমাকে এই একই ঘটনা বর্ণনা করেছিলেন। তিনি নিজে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম)–এর কাছ থেকেই এ ঘটনা শুনেছিলেন। পার্থক্য শুধু এই যে, মাওলভী সাহেব বাটালার পরিবর্তে অমৃতসরের নাম উল্লেখ করেছিলেন এবং দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন যে, সেই হিন্দু এই অলৌকিক ঘটনাটি উপলব্ধি করেছিল এবং অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছিল।

(৮) আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

আমার নিকট আমার সম্মানিতা মাতা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন–একবার তিনি একটি মামলার কারণে ডালহৌসি পাহাড়ে যাচ্ছিলেন। পথে বৃষ্টি শুরু হলে তিনি ও তাঁর সঙ্গী গাড়ি থেকে নেমে রাস্তার পাশে অবস্থিত এক পাহাড়ি লোকের বাড়ির দিকে যান। তাঁর সঙ্গী এগিয়ে গিয়ে গৃহস্বামীর কাছে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি বাধা দেন। এ নিয়ে উভয়ের মধ্যে তর্ক শুরু হয় এবং গৃহস্বামী উত্তেজিত হয়ে গালিগালাজ করতে থাকে।

হযরত সাহেব বলেন, এই তর্ক শুনে তিনি এগিয়ে যান। আমার ও গৃহস্বামীর চোখ চোখে পড়তেই, আমি কিছু বলার আগেই সে মাথা নত করে বলে, "আসলে কথা হলো, আমার একটি যুবতী কন্যা আছে; এজন্য আমি অপরিচিত লোককে ঘরে ঢুকতে দিই না। তবে আপনি নিশ্চিন্তে ভেতরে আসতে পারেন।" হযরত সাহেব বলতেন যে, সে আমার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল; না আমি তাকে চিনতাম, না সে আমাকে চিনত।

(৯) আল্লাহর নামে, যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

আমার নিকট আমার সম্মানিতা মাতা বর্ণনা করেছেন যে, তাঁকে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) বলেছেন–একবার সফরের সময় রাতে আমরা একটি বাড়ির দোতলার একটি কক্ষে (চোবারা) অবস্থান করছিলাম। একই কক্ষে আরও সাত–আটজন লোকও ছিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর এবং রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হলে আমি টুকটুক শব্দ শুনতে পাই এবং আমার মনে আশঙ্কা জাগে যে, এই কক্ষের ছাদ পড়ে যেতে পারে।

আমি আমার সঙ্গী মাসিতা বেগকে ডেকে বলি যে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে ছাদ পড়ে যাবে। সে বলে, "মিঞা, এটা তোমার কল্পনা মাত্র। এটা নতুন তৈরি বাড়ি, আর ছাদও একেবারে নতুন। নিশ্চিন্তে ঘুমাও।" হযরত সাহেব বলেন, আমি আবার শুয়ে পড়লাম; কিন্তু কিছুক্ষণ পর আবার সেই ভয় আমার মনে চেপে বসে। আমি আবার সঙ্গীকে জাগালাম, কিন্তু সে একই ধরনের উত্তর দিল। বাধ্য হয়ে আমি আবার শুয়ে পড়লাম; কিন্তু অল্প পরেই আমার মনে সেই ভাবনাটি প্রবলভাবে ফিরে এলো, এমন মনে হচ্ছিল যেন কোনো কড়িবরগা ভেঙে পড়তে যাচ্ছে।

তখন আমি ভীষণ উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠে পড়লাম এবং এবার প্রদীপ হাতে নিয়ে সঙ্গীকে বললাম, "আমি যখন বলছি ছাদ পড়ে যাবে, তখন তুমি উঠছ না কেন?"বাধ্য হয়ে সে উঠল, আর আমরা অন্যদেরও জাগিয়ে দিলাম। এরপর আমি সবাইকে বললাম, "দ্রুত বাইরে বের হয়ে নিচে নেমে যাও।" দরজার পাশেই সিঁড়ি ছিল। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে রইলাম এবং তারা একে একে বেরিয়ে নিচে নেমে গেল।

যখন সবাই বের হয়ে গেল, তখন হযরত সাহেব বলেন, আমি পা বাড়ালাম। আমার পা হয়তো অর্ধেক বাইরে ছিল আর অর্ধেক দোরগোড়ায়–ঠিক সেই মুহূর্তেই হঠাৎ ছাদ ভেঙে পড়ল, এবং এমন জোরে পড়ল যে নিচের তলার ছাদও সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে পড়ল। হযরত সাহেব বলেন, আমরা দেখলাম যে, যেসব চারপাইয়ের ওপর আমরা শুয়ে ছিলাম, সেগুলো একেবারে চূর্ণ–বিচূর্ণ হয়ে গেছে।

এই বিনীত বর্ণনাকারী আমার মাতাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, মাসিতা বেগ কে ছিলেন। তিনি উত্তর দেন, তিনি তোমার দাদার এক দূর–নিকট আত্মীয় ছিলেন এবং তাঁর কর্মচারীও ছিলেন।

এই বিনীত বর্ণনাকারী আরও নিবেদন করেন যে, হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় একবার এই ঘটনাটি অন্যভাবে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি বলেন, ঘটনাটি শিয়ালকোটে ঘটেছিল, যেখানে হযরত মসীহ মওউদ (আলাইহিস সালাম) কর্মরত ছিলেন, এবং হযরত মসীহ মওউদ বলতেন যে, তখন তাঁর এমন মনে হয়েছিল যেন ছাদটি কেবল তাঁর বাইরে বের হওয়ার অপেক্ষা করছিল। হযরত খলিফাতুল মসীহ দ্বিতীয় আরও উল্লেখ করেন যে, সেই কক্ষে তখন কয়েকজন হিন্দুও উপস্থিত ছিল, যারা এই ঘটনার ফলে হযরত সাহেবের গভীর ভক্ত হয়ে যায়।(ক্রমশ)

(সীরাতুল মাহদী, পৃষ্ঠা ৫–৭, প্রকাশিত: কাদিয়ান)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir